স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

দ্য সাইন অফ ফোর

চারের সংকেত

অদ্রীশ বর্ধন
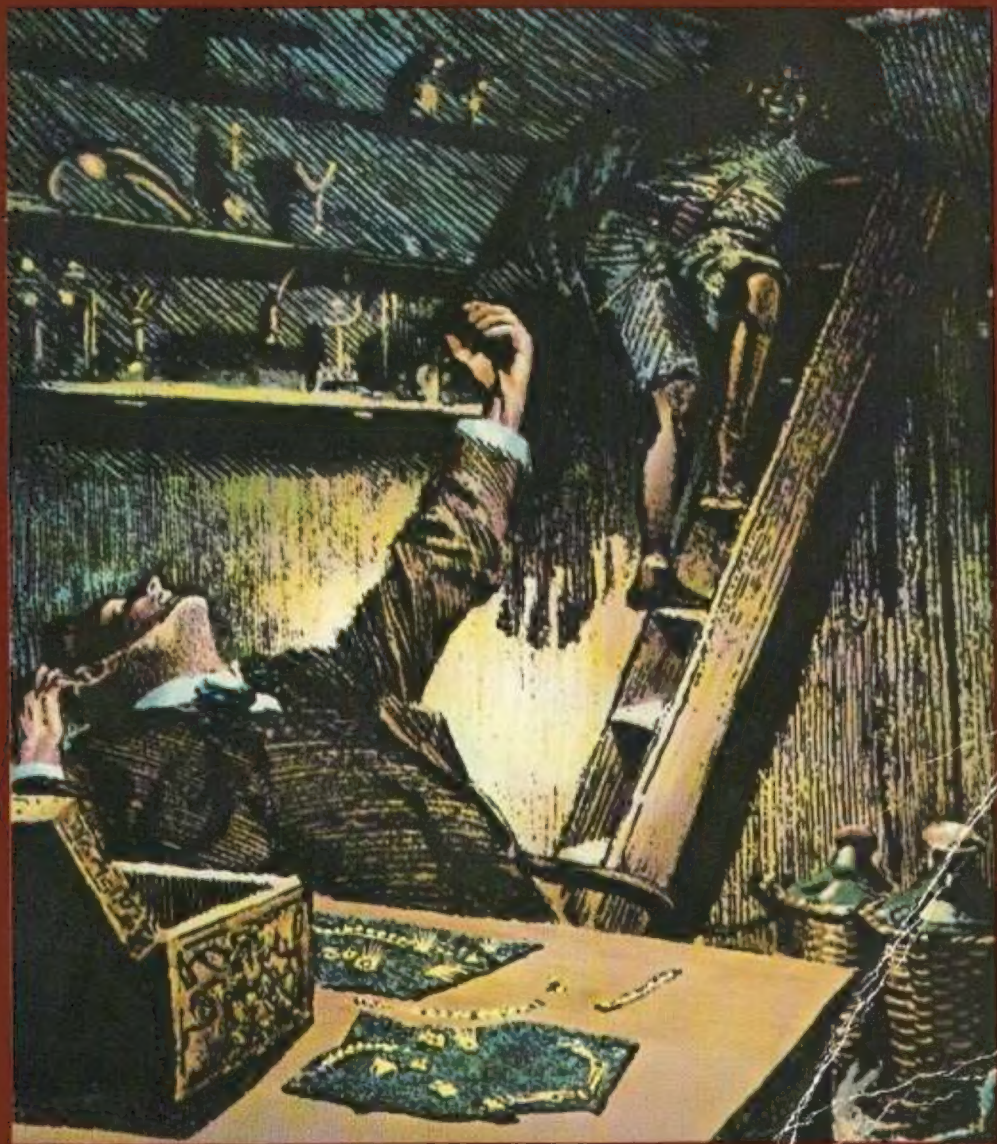
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

চারের সংকেত

[দ্য সাইন অফ ফোর]

অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

eBook Created By: **Sisir Suvro**

প্রচ্ছদ: **বিদেশী বই থেকে সংগ্রহীত**

লালমাটি, ২০১১

১. অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান

ম্যান্টলপিসের কোণ থেকে বোতলটা নামিয়ে আনল শার্লক হোমস, সুদৃশ্য মরক্কো কেস থেকে বার করল ইঞ্জেকশন দেওয়ার হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। দীর্ঘ, সাদা, কম্পিত আঙুল দিয়ে সরু ছুঁচটা ঠিক করে লাগিয়ে গুটিয়ে নিল শার্টের বাঁ-হাতা। চিন্তামগ্ন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শিরা-বার-করা বাহুর ওপর অসংখ্য ফুটো ফুটো দাগের দিকে— সবই ছুঁচ ফোটানোর দাগ— চামড়ার চেহারা পর্যন্ত পালটে গিয়েছে। শেষকালে ফের ছুঁচ ফুটাল সেই দাগের ওপরেই, তীক্ষ্ণ সূচীমুখ আস্তে আস্তে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল চামড়ার তলায়, ছোট্ট পিস্টনে চাপ দিয়ে সবটুকু তরল পদার্থ চালান করল শরীরের মধ্যে এবং নরম পরিতৃপ্তির সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলে এলিয়ে পড়ল মখমল মোড়া হাতল-চেয়ারের পিঠে।

দিনে তিনবার হিসেবে বহু মাস ধরে এই একই কাণ্ড দেখে আসছি আমি। কিন্তু গায়ে পড়ে বলাটা সৌজন্য-বিরোধী বলে কিছু বলিনি। বরং ভেতরে ভেতরে বিবেকের দংশন অনুভব করেছি, মুখের ওপর কিছু বলার সাহস নেই বলে এবং না-বলতে পারার জ্বালায় তিল তিল করে খিঁচিয়ে উঠেছে মেজাজটা। প্রতিবার এই দৃশ্য দেখেছি, মনে মনে সংকল্প করেছি, আর নয়, এবার দু-কথা শুনিয়ে ছাড়ব। কিন্তু প্রতিবারই বন্ধুবরের শান্ত, বেপরোয়া মুখচ্ছবি দেখে পিছু হটে এসেছি। দুনিয়ায় সে কাউকে পরোয়া করে না এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ একেবারে পছন্দ করে না। ওকে দেখছি অনেকদিন, দেখেছি ওর সাহস কত সুদূরপ্রসারী, চিনেছি ওর কর্তৃত্বময় ব্যক্তিত্ব, পেয়েছি ওর বহু বিচিত্র অসাধারণ সম্যক পরিচয়, জেনেছি ওর বিরাট শক্তি কী বিচিত্র— তাই ঘাটাতে চাইনি— সাহসও পাইনি— কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু সেদিন বিকেলে কী যে হল আমার, দুপুরে খেতে বসে 'বোন' মদ খাওয়ার ফল কি না জানি না, দিনের পর দিন এই দৃশ্য দেখে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার

জন্যেও হতে পারে অথবা ওর ধরনধারণের মধ্যে সুগভীর নিবিষ্টতা দেখার জন্যেও হতে পারে— হঠাৎ মনে হল, আর সহ্য করা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, আজ কী? মর্কিন না কোকেন?

কালো হরফে ছাপা একটা প্রাচীন গ্রন্থ খুলে বসেছিল হোমস। আমার কথায় অবসন্ন চোখ তুলল বইয়ের পাতা থেকে।

বললে, কোকেন— সেভেন পার্সেন্ট সলিউশন। পরখ করে দেখবে নাকি।

নিশ্চয় না, ঝটিতি বললাম আমি। আফগান ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি আমার শরীর, বাড়তি বোঝা আর চাপাতে চাই না।

মৃদু হাসল হোমস। বলল, হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ ওয়াটসন। জিনিসটার শারীরিক প্রতিক্রিয়া খারাপ হলেও হতে পারে— তবে কী জান, এর আধ্যাত্মিক প্রসাদ এতই চনমনে যে বলবার নয়। মনকে কাচের মতো স্পষ্ট করে তোলে। সেটাও মুখ্য লাভ। গৌণ প্রতিক্রিয়া সে তুলনায় নগণ্য।

আন্তরিক সুরে বললাম, কিন্তু কী দাম দিতে হচ্ছে তার বিনিময়ে, সেটা কি ভেবেছ? ব্রেন উত্তেজিত হচ্ছে ঠিকই, সুষুপ্তি থেকে যেন নতুন উত্তেজনায় জেগে উঠেছে— কিন্তু সেটা দেহের কোষের সর্বনাশ ঘটিয়ে তবে হচ্ছে— টিস্যুগুলো আরও বেশি পালটে যাচ্ছে বলেই হচ্ছে— শেষকালে আসছে একটা স্থায়ী অবসাদ, দুর্বলতা। তুমি নিজেও টের পাও একটা আচ্ছন্নতায় ঢেকে যায় তোমার সমস্ত চেতনা। ক্ষতি যা হচ্ছে, সে তুলনায় লাভটাই বরং অতি সামান্য। ঈশ্বর তোমাকে অনেক প্রতিভা দিয়ে পাঠিয়েছেন, অসামান্য সেইসব ক্ষমতার সর্বনাশ কেন করছ সাময়িক সুখের জন্য? নিছক বন্ধু হিসেবে এত কথা বললাম ভেব না যেন, ডাক্তার হিসেবেও আমার একটা কর্তব্য আছে— তোমার শরীরের সর্বনাশ ঘটলে জবাবদিহি আমাকে করতে হবে।

কথার তোড়ে হোমসের গায়ে আঁচ লাগল বলে মনে হল না— ক্ষুব্ধ হল না বিন্দুমাত্র। উলটে আঙুলের দশ ডগা একত্র করে চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে এমনভাবে হেলান দিয়ে বসল যেন আলোচনাটা বেশ জুতসই এবং মনের মতো।

বললে, 'ভায়া' আমার এই মনটা জড়সড় থাকতে চায় না মোটেই— বিদ্রোহ করে বসে নিশ্চলতার বিরুদ্ধে। সমস্যা দাও, জটিলতম সাংকেতিক ধাঁধা দাও, কাজ দাও, সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ দাও, মন আমার অমনি ঠান্ডা হয়ে যাবে, বিদ্রোহী মনকে শায়েস্তা রাখার ওই একমাত্র দাওয়াই— আমার মনের খোরাকও তাই। তখন কিন্তু কৃত্রিম উত্তেজকের আর দরকার হয় না। কিন্তু একঘেয়ে জীবনযাত্রা আমার দু-চক্ষের বিষ। আমি চাই মানসিক উত্তেজনা— মন যেন সদ্য উদবেলিত থাকে নিত্যনতুন সমস্যায়, রোমাঞ্চময়, প্রহেলিকাময়। এ-পেশা নিয়েছি তো সেই কারণেই বলতে পার— পেশাটা সৃষ্টিই করেছি আমি— কেননা তাবৎ বিশ্বে আমিই এক এবং অদ্বিতীয়।

এক এবং অদ্বিতীয় বেসরকারি গোয়েন্দা? বললাম ভুরু তুলে।

এক এবং অদ্বিতীয় বেসরকারি কনসাল্টিং গোয়েন্দা, জবাব দিল হোমস।

গোয়েন্দাগিরিতে আপিল করতে গেলে আমি ছাড়া আর গতি— গোয়েন্দাগিরিতে সর্বোচ্চ আর সর্বশেষ আদালত বলতে গেলে আমিই। গ্রেগসন, লেসট্রেড অথবা অ্যাথেলনি জোন্স যখন হালে পানি পায় না— ওদের বিদ্যেবুদ্ধিতে ওর চাইতে বেশিও সম্ভব নয়— তখন কেস নিয়ে ধরনা দেয় আমার কাছে। বিশেষজ্ঞর মতোই কেসটার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি, তারপর বিশেষজ্ঞের মতোই মতামত প্রকাশ করি। এসব কেসে কৃতিত্ব দাবি করি না— খবরের কাগজেও আমার নাম বেরোয় না! কাজের মধ্যে আমার আনন্দ আমার, বিচিত্র ক্ষমতাকে উপযুক্ত পরিবেশে প্রকাশ করতে পারাটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। জেফারসন হোপের সঙ্গে আমার কাজের ধারার কিছু অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে।

তা হয়েছে, বললাম সহৃদয় কণ্ঠে, জীবনে এমন চমকান চমকাইনি। অভিজ্ঞতা তোমার লিখেও ফেলেছি ছোট্ট বইয়ের আকারে। নাম হয়েছে একটু ফ্যানটাসটিক— এ স্টাডি ইন স্কারলেট।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল হোমস।

বলল, পাতা উলটে দেখেছি বইটার। সত্যি কথা বলতে কী, প্রশংসা করতে পারছি না তোমাকে। গোয়েন্দাগিরি জিনিসটা একটা নির্জলা বিজ্ঞান। এ-জিনিস লেখাও উচিত সেইভাবে— আবেগহীন নিরুত্তাপভাবে। কিন্তু তুমি তার মধ্যে রোমান্স ছিটিয়েছ যখন তখন— ফলটা হয়েছে বদখত ধরনের ইউক্লিডের পঞ্চম উপপাদ্যের সঙ্গে প্রেমের গল্প অথবা প্রেয়সীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার গল্প মিশিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়— তোমার কাহিনিও দাঁড়িয়েছে সেইরকম।

প্রতিবাদের সুরে বললাম, সে কী কথা! রোমান্স তো ছিল জেফারসন হোপের কেসে। ঘটনাকে বিকৃত করার অধিকার তো আমার নেই।

কিছু কিছু ঘটনা চেপে যাওয়াই উচিত, অথবা লেখবার সময়ে একটু মাত্রাজ্ঞান রাখা উচিত। কেসটায় একটাই পয়েন্ট আছে উল্লেখ করবার মতো এবং তা আমাকে নিয়ে— কীভাবে কার্য থেকে কারণে বিচিত্র যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমি উপনীত হলাম এবং রহস্য ফাঁস করে ছাড়লাম।

খুবই বিরক্ত হলাম কথার ধরন শুনে। কাহিনিটা লিখলাম যার তুষ্টি সাধনের জন্যে, সে-ই কিনা যা মুখে আসে তাই বলছে এতদিনকার প্রচেষ্টা নিয়ে। মেজাজ খিচড়ে গেল ওর দম্ভের জন্যেও বটে। বলে কিনা কাহিনির প্রতিটি লাইন উৎসর্গ করা উচিত ছিল স্তুতিবাদে। বেকার স্ট্রিটে এক বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে গিয়ে এই ক-বছরের মধ্যে লক্ষ করেছি বন্ধুবরের প্রশান্ত, নীতিগর্ভ আচরণের তলায় উঁকি মারে ছোট্ট অহংকার। তাই আর কোনো মন্তব্য করলাম না। জখম পা-টায় হাত বুলোতে লাগলাম চেয়ারে বসে। দীর্ঘকাল আগে একটা ডিজেল

বুলেট ঢুকেছিল পায়ে। হাঁটতে কষ্ট না-হলেও ঋতু পরিবর্তনের সময়ে মাথাচাড়া দেয় পুরোনো ব্যথাটা।

কিছুক্ষণ পরে সেকেলে ব্রায়ার পাইপটায় তামাক ঠাসতে ঠাসতে হোমস বললে, সম্প্রতি মহাদেশের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়েছে আমার প্র্যাকটিস। গত হপ্তায় আমার পরামর্শ নিয়ে গেছে ফাসোয়ালা ভিলার্ড। নাম শুনেছ বোধ হয়। ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগে ইদানীং পয়লা নম্বর লোক। সহজাত বুদ্ধি দিয়ে ঝট করে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও ভদ্রলোকের মধ্যে একটা বড়ো রকমের ঘাটতি আছে। গোয়েন্দাগিরি একটা আর্ট। এ-আর্টে উঁচুদরের শিল্পকর্ম দেখাতে গেলে বিশেষ পড়াশুনা করা দরকার। এটি তার নেই! কেসটা একটা উইল সংক্রান্ত ঝামেলা নিয়ে। মাথা ঘামানোর মতো বেশ কিছু পয়েন্টও আছে। আমি শুধু ওঁকে দুটো সমতুল্য কেসের খুঁটিনাটি পড়ে নিতে বলেছিলাম— তার কেসের সমাধান রয়েছে ওই দুটো কেসেই— একটা ১৮৫৭ সালের রিগ রহস্য, আর একটা ১৮৭১ সালের সেন্ট লুই রহস্য। পরামর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে ভদ্রলোক চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা পেলাম আজ সকালে। পড়ে দেখ।

বলতে বলতে একটা দলা পাকানো বিদেশি কাগজ আমার দিকে ছুড়ে দিল হোমস। চোখ বুলোতে গিয়ে ভুরি ভুরি প্রশংসা-বিশেষণই কেবল চোখে পড়ল। ফরাসিরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে যেসব বাছাই করা বুলি ছাড়ে— কোনোটাই বাদ যায়নি।

বললাম, গুরুর কাছে শিষ্যের লেখা চিঠি বলে মনে হচ্ছে।

লঘুভাবে হোমস বললে, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে— পরামর্শটা সামান্য– ওঁর কাছে তা অসামান্য। প্রতিভার দিক দিয়ে নিজেও বড়ো কম যান না। আদর্শ ডিটেকটিভ হতে গেলে যে তিনটি গুণ অপরিহার্য, ওঁর মধ্যে তার দুটো আছে। পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আছে, অবরোহ মতে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা

আছে। অভাব শুধু পড়াশুনার— সেটা যথাসময়ে হয়ে যাবে। আমার লেখাগুলো এখন ফরাসিতে তরজমা করছেন ভদ্রলোক।

তোমার লেখা?

সে কী তুমি জান না? হেসে বললে হোমস। বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে অপরাধী আমি। সবই পেশা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর। যেমন ধর না একটা— বিভিন্ন তামাকের ছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত। এ-প্রবন্ধে একশো চল্লিশ রকম সিগারেট, চুরুট আর তামাক পাইপের বর্ণনা দিয়েছি এবং রঙিন ছবি দিয়ে দেখিয়েছি একটি ছাইয়ের সঙ্গে আর একটির ছাইয়ের তফাত কোথায়। আদালতে অপরাধীদের মামলা চলার সময়ে এই একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে— কখনো-সখনো দেখা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে এর জুড়ি নেই। যেমন ধর না কেন, তুমি যদি নিশ্চিন্তভাবে বলতে পার যে খুন করার সময়ে অমুক ব্যক্তি ভারতীয় লুঙ্কা চুরুট খাচ্ছিল— অনেক ছোটো হয়ে আসে তোমার তদন্তের গণ্ডি। বাঁধাকপি আর আলুর মধ্যে যে তফাত, ত্রিচিনোপল্লি চুরুটের কালো ছাই আর বার্ডস আইয়ের সাদা পেজ ছাইয়ের মধ্যে তেমনি অনেক তফাত, চক্ষের নিমেষে ধরা পড়ে যায় অভিজ্ঞ চোখে।

তুচ্ছ বিষয়ের পর্যবেক্ষণে তোমার জুড়ি নেই— সত্যিই প্রতিভা তোমার অসাধারণ— মন্তব্য করি আমি।

তুচ্ছ হলেও ফ্যালনা কিছুই নয়— গুরুত্ব বুঝে তার কদর করি। এই দেখ আমার লেখা আর একটা প্রবন্ধ— কীভাবে পায়ের ছাপ দেখে ছাপের মালিকের নাড়িনক্ষত্র জানা যায় তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছি এর মধ্যে। সেইসঙ্গে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে পদচিহ্নের ছবি তোলবার কথাও বলেছি। এই নাও আর একটা ছোট্ট লেখা— হাতের ওপর পেশার ছাপ কীভাবে পড়ে খুঁটিয়ে লিখেছি। অদ্ভুত বিষয় কিন্তু। অনেক হাতের লিথোটাইপ ছবিও দিয়েছি। স্লেটপাথর নিয়ে যারা কাজ করে, ছাপাখানায় যারা টাইপ কম্পোজ করে, যারা

কাপড় বোনে, যারা হিরে পালিশ করে, যারা জাহাজের খালাসির কাজ করে, যারা ছিপি কাটে— এদের প্রত্যেকের হাত দেখলেই বলে দেওয়া যায় কার কী পেশা? সায়েন্টিফিক ডিটেকটিভের কাছে বিষয়টার ব্যবহারিক গুরুত্ব কী প্রচণ্ড। বিশেষ করে বেওয়ারিশ লাশ শনাক্ত করার সময়ে অথবা অপরাধীর পূর্ব বৃত্তান্ত উদ্ধার করবার সময়ে এই বিদ্যার প্রয়োজন হয় খুব বেশি। যাক গে ভায়া, আমার শখের কাহিনি শুনিয়ে তোমায় হাফ ধরাতে আর চাই না।

মোটেই না, বললাম সাগ্রহে। তোমার কাজের ধারা স্বচক্ষে দেখেছি বলেই বলছি, প্রবন্ধগুলোর গুরুত্ব আমার কাছে অনেক— তুমি যা লিখেছ তা হাতে-কলমে দেখিয়েছ আমার সামনেই। তবে এইমাত্র পর্যবেক্ষণ আর অবরোহমতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্বন্ধে বলছিলে। দুটোই প্রায় একই বস্তু নয় কি?

নীলচে কালো ধোঁয়া ছাড়তে লাগল পাইপ থেকে। বলল, যেমন ধর, পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল আজ সকালে তুমি উইমগোর স্ট্রিটে পোস্ট অফিসে গিয়েছিলে, কিন্তু অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকাশ পাচ্ছে তুমি সেখানে গেছিলে একটা টেলিগ্রাফ পাঠানোর কাজে।

বলেছ ঠিক! দুটিই খাঁটি সত্যি! কিন্তু বুঝলাম না তুমি জানলে কী করে। হঠাৎ ইচ্ছে হল টেলিগ্রাম পাঠানোর— কাউকে তো বলিনি আমি।

আমার বিস্ময় দেখে খুক খুক করে কাষ্ঠ হেসে শার্লক হোমস বললে, ব্যাপারটা জলের মতো সোজা। এত সোজা যে ব্যাখ্যা করাটাও একটা বাড়াবাড়ি। তাহলেও করব পর্যবেক্ষণ আর অবরোহমূলক সিদ্ধান্তর সীমারেখা স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যে। পর্যবেক্ষণের শেষ কোথায় এবং অবরোহ সিদ্ধান্তের শুরু কোনখান থেকে— সেটা বোঝা তোমার একান্ত দরকার। তোমাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, তোমার পায়ের পাতার ওপরদিকে একটা লালচে ডেলা লেগে রয়েছে। উইমগোর স্ট্রিট পোস্ট অফিসের উলটো দিকে ফুটপাথ খোড়া হয়েছে দেখছি। নীচের মাটি বেরিয়ে পড়েছে এবং সে-মাটি একটু লালচে ধরনের—

ধারে কাছে আর কোথাও দেখা যায় না। মাটিটা বেরিয়ে আছে এমন জায়গায় যে পোস্ট অফিসে ঢুকতে গেলে পায়ের পাতায় লাগবেই— এড়ানো যায় না। পর্যবেক্ষণের দৌড় এই পর্যন্ত। বাকিটা ধাপে ধাপে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌছোনোর ব্যাপার।

ধাপে ধাপে কী চিন্তা করে তুমি জানলে যে আমি টেলিগ্রাম পাঠাতে গিয়েছিলাম?

সে আর এমন কী ব্যাপার। সারাসকাল তো তোমার সামনেই বসে আছি। একটা চিঠিও লিখতে দেখিনি। তোমার টেবিলেও দেখছি এক বান্ডিল পোস্টকার্ড আর বেশ কিছু ডাকটিকিট রয়েছে। তা সত্ত্বেও তুমি যখন পোস্ট অফিসে গেছ, নিশ্চয় টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্যেই। অন্যান্য সব কারণ বাদ দিতে দিতে শেষ যে-কারণে পৌছোবে— জানবে সেইটাই আদত সত্যি।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, এ-কেসে অবশ্য সত্যি জলের মতোই সোজা— তোমার কথাই বলছি তোমাকে। যদি ধৃষ্টতা হিসেবে না নাও। তোমার তত্ত্বগুলোকে আরও কঠোরভাবে যাচাই করতে পারি কি?

নিশ্চয় পার। রাগ তো করবই না। বরং উপকৃত হব। কোকেনের সেকেন্ড ডোজটা আর নিতে হবে না। যেকোনো সমস্যা হাজির করতে পার, সানন্দে মাথা ঘামাব।

তোমাকেই বলতে শুনেছি দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে কোনো জিনিসের ওপর মানুষটার ব্যক্তিসত্তার ছাপ এমনভাবে আঁকা হয়ে যায় যে অভিজ্ঞ চোখে তা ধরা পড়বেই। কিছুদিন হল একটা ঘড়ি এসেছে আমার কাছে। যার ঘড়ি তার চরিত্র, স্বভাব, ঘড়ি দেখে বলতে পারবে? মনের মধ্যে একটা চাপা আনন্দ নিয়েই ঘড়িটা তুলে দিলাম বন্ধুবরের হাতে। হামবড়াই সুরে গায়ের জোরে বড্ড তত্ত্ব আওড়ায় হোমস, থোঁতা মুখ এবার ভোঁতা করা যাবে— দর্পচূর্ণ হবে— উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে। ঘড়িটা হাতে নিয়ে হোমস তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল ডায়ালের

দিকে, পেছনের ডালা খুলে খুঁটিয়ে দেখল ভেতরকার কলকবজা— প্রথমে খালি চোখে, তারপর একটা শক্তিশালী আতশকাচ দিয়ে। খটাস করে ডালা বন্ধ করে ঘড়িটা যখন ফিরিয়ে দিল আমার হাতে, তখনকার সেই চোয়াল-ঝুলে পড়া শুকনো মুখচ্ছবি দেখে আনন্দ আর চাপতে পারলাম না— হেসে ফেললাম।

ঘড়িটা সম্প্রতি সাফ করা হয়েছে তেল দিয়ে। ফলে সিদ্ধান্তে আসার মতো কোনো চিহ্ন আর পড়ে নেই, বললে ও।

বলেছ ঠিক। আমার কাছে পাঠানোর আগে তেল দিয়েই সাফ করা হয়েছে ঘড়ি।

মনে মনে কিন্তু ফালতু অজুহাত দেখানোর অপরাধে অপরাধী করলাম বন্ধুবরকে। নাচতে না-জানলে উঠোনের দোষ। ঘড়ি যদি তেল দিয়ে সাফ না-করাই হত, এমন কী চিহ্ন সে আবিষ্কার করত ঘড়ির কলকবজা থেকে? যত্তো সব...।

না-হলেও ঘড়ি নিয়ে গবেষণা একেবারে বৃথা যায়নি। ভুল হলে শুধরে দিয়ো। আমার সিদ্ধান্ত— এই ঘড়িটা তোমার বড়দার— তিনি পেয়েছিলেন তোমার বাবার কাছ থেকে!

ঘড়ির পেছনে H. W. অক্ষর দুটো দেখে নিশ্চয় বলছ?

হ্যাঁ W হল তোমার নামের আদ্যক্ষর। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার তারিখ রয়েছে ঘড়ির মধ্যে; অর্থাৎ এ-ঘড়ি আমাদের বাবাদের আমলের ঘড়ি। জড়োয়া জিনিস সাধারণত বাড়ির বড়ো ছেলে পায়— বাবার নামেই তার নাম হয়। আমি জানি তোমার বাবা গত হয়েছেন বহু বছর আগে। তার মানে এ-ঘড়ি এসেছিল তোমার বড়দার হাতে।

ঠিক হচ্ছে। আর কিছু?

তিনি একটু অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ— একটু কেন বেশিই বলতে পার। হুশ নেই কোনোদিকে। বেপরোয়া, অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। কিন্তু টাকা

রাখতে হয় কী করে জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে— আবার কখনো টাকায় গড়াগড়ি দিয়েছেন। শেষকালে মদ ধরেন এবং মারা যান। বলার মতো আর কিছু পাচ্ছি না।

চেয়ার থেকে ছিটকে গেলাম আমি। খোড়াতে খোড়াতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম ঘরময়— তিক্ততায় টইটম্বর হয়ে উঠল ভেতরটা।

আমার দাদা বেচারার খবর আগেই নিয়েছ, এখন এমন ভান করলে যেন ঘড়ির মধ্যে থেকে সে খবর উদ্ধার করলে। সামান্য একটা পুরোনো ঘড়ি দেখে এত কথা বলা যায়, আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করাতেও পারবে না? ভণ্ডামিটুকু না-করলেই পারতে। কী অন্যায়! কী অন্যায়!

সহৃদয় কণ্ঠে হোমস বললে, ভায়া ডাক্তার, ক্ষমা করো আমাকে। ব্যাপারটাকে একটা গুঢ় সমস্যা হিসেবেই নিয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম বিষয়টা ব্যক্তিগত এবং দুঃখ পেতে পার। তবে বিশ্বাস কর, এ-ঘড়ি হাতে আসার আগে জানতাম না তোমার একজন ভাই আছে।

তাহলে জানলে কী করে? সবই তো সত্য ঘটনা— নির্জলা সত্যি।

সেটা আমার কপাল। আমি কতকগুলো সম্ভাবনার কথা বলেছি কেবল, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে যাবে ভাবিনি।

তবে কী, যা বললে তা নিছক অনুমান নয়?

অনুমান? আরে না, অনুমান আমি কখনো করি না। খুব খারাপ অভ্যেস– যুক্তিবোধের সর্বনাশ করে ছাড়ে। আমার চিন্তার ধারাটা তুমি অনুধাবন করতে পারোনি বলেই পুরো ব্যাপারটা মনে হচ্ছে এত অদ্ভুত। ঘটনা যত ছোট্টই হোক না কেন, তাকে যদি ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করা যায়— বৃহৎ সিদ্ধান্ত না-এসে পারে না। যেমন ধর না কেন, আমি তোমাকে প্রথমেই বললাম, তোমার বড়দাটার হুশ ছিল না কোনোদিকে। ঘড়ির তলার দিকটা লক্ষ করলেই দেখবে শুধু যে দু-জায়গায় তুবড়ে গেছে তা নয়, সারাগায়ে বিস্তর আঁচড় আর কাটার দাগ রয়েছে,

যেন কঠিন বস্তুর সঙ্গে ঘড়িটাকে রেখে দেওয়ার বদভ্যেস ছিল— অর্থাৎ চাবি আর খুচরো পয়সার সঙ্গে এমন একটা রত্নখচিত ঘড়িও অবহেলায় রেখে দেওয়া হত একই পকেটে। যে-লোক পঞ্চাশ গিনি দামের ঘড়ি এত হেলাফেলাভাবে পকেটে নিয়ে বেড়ায়, সবদিকে তার হুশ আছে, এ-কথা কি বলা যায়? এই থেকেই আসা যায় আর একটা সিদ্ধান্তে, এত দামি বস্তুর মালিক যিনি, তার অন্যান্য জিনিসেরও অভাব নিশ্চয় নেই।

যুক্তিপ্রবাহ সুস্পষ্ট হওয়ায় মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। ইংলন্ডের বন্ধকি কারবারিদের স্বভাব হল ঘড়ি বাধা রাখলেই টিকিটের নম্বরটা পিন দিয়ে খুঁচিয়ে ডালার ভেতর দিকে লিখে রাখে। লেবেল লাগাবার চাইতে নিরাপদ, হারাতে পারে, কিন্তু খোদাই করা নম্বর থেকে যাবে। ডালার মধ্যে এ-রকম নম্বর দেখলাম কম করেও চারটে। সিদ্ধান্ত একটাই— হামেশাই টাকার টানাটানি গিয়েছে তোমার দাদার! এ থেকে বেরোচ্ছে একটা শাখা সিদ্ধান্ত— মাঝে মাঝে দৈন্যদশা কাটিয়ে ফের টাকায় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন বলেই দামি ঘড়িটা ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল বন্ধকি কারবারির খপ্পর থেকে। সবশেষে তোমাকেই বলব চাবির গর্ত যাতে আছে ভেতরকার সেই পাতটার দিকে একটু তাকাও! চাবির চারপাশে হাজার হাজার আঁচড়ের দাগ দেখছ না? চাবি ফসকে যাওয়ার দাগ। মাতাল না-হলে সুস্থির মানুষের হাত এভাবে কখনো অস্থির হয়? মাতালরা কিন্তু কখনো ঘড়ি কাছ ছাড়া করে না— রাতে শোবার সময়ে ঘড়িতে দম দেয়— কাঁপা হাতে এই ধরনের দাগ ফেলে চাবির গর্তের পাশে। এখন বলো, রহস্যটা কোথায়?

কোথাও নেই, দিনের আলোর মতোই সব স্পষ্ট করে দিলে তুমি, বললাম আমি।

তোমার ওপর অবিচার করার জন্যে অনুশোচনা হচ্ছে। তোমার বিস্ময়কর এই ক্ষমতায় আমার আরও একটু আস্থা থাকা উচিত ছিল। যাক গে, তোমার যা পেশা, সে-রকম কোনো কাজ এখন হাতে আছে নাকি?

একদম না। সেইজন্যেই তো কোকেন নিচ্ছি। মগজকে না-খাটিয়ে আমি থাকতে পারি না। তা ছাড়া জীবনের আর কী উদ্দেশ্য বলতে পার। এসো, এই জানালাটার সামনে দাঁড়াও। দুনিয়াটার এ-রকম চেহারা কখনো দেখেছ? নিরানন্দ, দুঃখময়, লাভ কোথাও নেই– কেবল লোকসান হলদে কুয়াশা দেখেছ কীরকম ঘুরপাক খেতে খেতে রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পিঙ্গল রঙের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে? গদ্যময়তা আর জড়বাদের এর চাইতে প্রকট রূপ আর কখনো দেখেছ? কী হবে শক্তি নিয়ে বলতে পার ডাক্তার? শক্তিকে প্রয়োগ করার উপযুক্ত ক্ষেত্রই যদি না-পাওয়া যায়, লাভ কী শক্তিমান হয়ে? অপরাধ জিনিসটাই আজকাল গতানুগতিক, মানুষের অস্তিত্বও গতানুগতিক, এই পরিস্থিতিতে মানুষের যে গুণ গতানুগতিক নয়— এ-সংসারে সে-গুণের কোনো চাহিদাই নেই।

গরম লেকচারের জবাব দেওয়ার জন্যে সবে মুখ খুলেছি, এমন সময়ে দরজায় ছোট্ট করে নক করে ঢুকল ল্যান্ডলেডি– হাতের তাম্র-রেকবে একটা কার্ড।

বললে বন্ধুবরকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান একজন ইয়ং লেডি। কার্ডটা পড়ল হোমস, মিস মেরি মর্সটান। হুম! এ-নাম তো কখনো শুনিনি— মনেই পড়ছে না। মিসেস হাডসন, ইয়ং লেডিটিকে বলুন, দয়া করে যেন ভেতরে আসেন। ডাক্তার তুমি যেয়ো না। আমি চাই তুমি থাক।

২। কেস বৃত্তান্ত

দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন মিস মর্স্টান। বাহ্যিক হাবভাব বেশ সংযত দেখলাম। মেয়েটি স্বর্ণকেশী ক্ষুদ্রকায়া। সাজসজ্জায় পারিপাট্য আছে। দু-হাত দস্তানায় ঢাকা। পরিচ্ছদ রুচিসুন্দর, প্রশংসার যোগ্য, মহার্ঘ নয়— সাদাসিদে। যা দেখে মনে হয়, হাতে ঢালাও টাকা তেমন নেই। চোখ জুড়োনো ধূসরাভ হলদেটে পোশাকে কাটছাটের চালিয়াতি একদম নেই। মাথায় ওই রঙেরই টুপি, একপাশে শুধু একটা সাদা পালকের ইশারা। মুখ চোখ খুব একটা নিখুঁত নয়, গায়ের রঙে রূপ ফেটে পড়ছে না। কিন্তু হাবভাব বেশ মিষ্টি এবং অমায়িক। বিশেষ করে বড়ো বড়ো নীল চোখদুটি সমবেদনা আর আধ্যাত্মিকতায় আশ্চর্যভাবে আকর্ষণীয়। তিন তিনটে মহাদেশের অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আমি এসেছি, কিন্তু কৃষ্টি আর সংবেদনশীলতার মূর্ত প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন এমন মুখ কখনো দেখিনি। তবে একটা জিনিস লক্ষ না-করে পারলাম না। বাইরে যতই সংযত আর দৃঢ় থাকুন না কেন, শার্লক হোমসের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসবার সময়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মেয়েটির ঠোঁট আর হাত— তীব্র উত্তেজনার সব লক্ষণই প্রকাশ পেল চোখে-মুখে।

'মি. হোমস', বললেন মিস মর্স্টান, আমার অন্নদাতা মিসেস সিসিল-ফরেস্টারের একটা সাংসারিক সমস্যার জট আপনি বড়ো সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার দক্ষতায় তার অগাধ বিশ্বাস, আপনার সুন্দর ব্যবহারে তিনি সত্যিই মুগ্ধ। সেইসূত্রেই এলাম আপনার কাছে।

মিসেস সিসিল ফরেস্টার, চিন্তামগ্নভাবে নামটা উচ্চারণ করল হোমস। তার একটা কাজ একবার করে দিয়েছিলাম বটে— অবিশ্যি কঠিন কিছু নয়— জলের মতো সোজা!

তিনি অবশ্য তা মনে করেন না। আমার কেসটাকে কিন্তু আপনি সোজা বলতে পারবেন না। এ-রকম জটিল, অদ্ভুত আর সাংঘাতিক দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে আমি জীবনে পড়িনি।

দু-হাত ঘষে নড়েচড়ে বসল শার্লক হোমস, প্রদীপ্ত হল চক্ষু। ইগল পাখির মতো শানিত চোখ-মুখে ফুটে উঠল অসামান্য একাগ্রতা— ঝুঁকে বসল চেয়ারের ওপর।

বলল কাটছাট কাজের গলায়, বলুন আপনার কেস!

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। বিষম বিব্রত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম— আমি তাহলে চলি—

মেয়েটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দস্তানা-পরা হাত তুলে নিরস্ত করে বিলক্ষণ বিস্মিত করলেন আমাকে।

বললেন, আপনার বন্ধু থাকলে কিন্তু আমার অশেষ উপকার হবে!

অগত্যা আমি বসে পড়লাম চেয়ারে। মিস মর্সটান বললেন, ছোট্ট করে বলা যাক ঘটনাগুলো। আমার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন। বাচ্চাবেলায় আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মা মারা যাওয়ার পর! ইংলন্ডে আমার কোনো আত্মীয় নেই। এডিনবরার একটি চমৎকার বোর্ডিংয়ে আমাকে মানুষ করার ব্যবস্থা উনি করেছিলেন— সেখানেই মানুষ হয়েছি আমার সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত। আমার বাবা ছিলেন ওঁর রেজিমেন্টের সিনিয়র ক্যাপ্টেন। ১৮৭৮ সালে বারো মাসের ছুটি নিয়ে উনি দেশে ফিরলেন। লন্ডন থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন আমাকে। লিখলেন সব কুশল, ভালোভাবেই দেশে ফিরেছেন, উঠেছেন ল্যাংঘাম হোটেলে, আমি যেন পত্রপাঠ চলে আসি। বেশ মনে আছে চিঠির মধ্যে স্নেহ ভালোবাসা আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়েছিল। লন্ডন পৌঁছে ল্যাংঘাম হোটেলে গিয়ে শুনলাম কাপ্টেন মর্সটান সেখানে উঠেছিলেন বটে কিন্তু আগের রাতে বেরিয়ে গেছেন— আর ফেরেননি। সারাদিন হা-পিত্যেশ করে বসে রইলাম তার

পথ চেয়ে! সেই রাত্রেই ম্যানেজারের কথামতো পুলিশে খবর দিলাম। পরের দিন সকালে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলাম। কিন্তু কোনো ফল হল না— নিরুদ্দিষ্ট বাবার কোনো খবরই সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি পাইনি, দেশে এসেছিলেন বুক ভরা আশা নিয়ে শান্তি আর আরামে ক-টা দিন কাটিয়ে যেতে, কিন্তু—

ফুঁপিয়ে উঠলেন মিস মর্সটান— অর্ধপথে স্তব্ধ হল কথা— হাত রাখলেন গলায়!

নোটবই খুলে হোমস প্রশ্ন করল, তারিখটা কবে?

১৮৭৮ সালের তেসরা ডিসেম্বর উনি অদৃশ্য হয়ে যান— প্রায় দশ বছর আগে।

মালপত্র?

হোটেলেই ছিল। সূত্র বিশেষ পাওয়া যায়নি। কিছু বই, জামাকাপড় আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিস্তর দুষ্প্রাপ্য জিনিস— দ্বীপান্তর কয়েদিরক্ষীদের উনিই ছিলেন সর্বপ্রধান।

শহরে কোনো বন্ধু ছিল ক্যাপ্টেন মর্সটানের?

একজনের নামই জানি আমি— মেজর শোল্টো— ওঁর রেজিমেন্টের কাজ করতেন— থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি। কিছুদিন আগেই অবসর নিয়েছিলেন মেজর, থাকতেন আপনার নরউডে, যোগাযোগ করে জেনেছিলাম উনি নাকি জানতেনই না যে সতীর্থ অফিসার ইংলন্ডে ফিরেছেন।

আশ্চর্য কেস দেখছি, মন্তব্য করল হোমস।

সবচেয়ে আশ্চর্য অংশটুকু তো এখনও বলিনি আপনাকে। বছর কয়েক আগে- ১৮৮২ সালের ৪ মে— 'টাইমস' পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন বেরোল— মিস মর্সটান যেন নিজের গরজে সাড়া দেন- ঠিকানাও জানিয়ে দেন। বিজ্ঞাপনে কারো নাম নেই, ঠিকানাও নেই! আমি তখন মিসেস সিসিলি ফরেস্টারের বাড়িতে

গৃহশিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে ঢুকেছি! ওঁর পরামর্শমতো দৈনিকের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ছাপিয়ে দিলাম আমার ঠিকানা। সেইদিনই ডাকযোগে একটা ছোটো কার্ডবোর্ডের কৌটো এল আমার নামে— ভেতরে একটা রীতিমতো প্রকাণ্ড মুক্তো— দারুণ জ্বলজ্বলে। কারো চিঠি নেই ভেতরে। সেইদিন থেকে ফি-বছর ঠিক ওইদিনে একইরকম কৌটোর মধ্যে ডাকে এসেছে একটি করে অবিকল ওইরকম মুক্তো! কিন্তু কে যে পাঠাচ্ছে, তার কোনো চিহ্ন থাকেনি কৌটোর মধ্যে। নামকরা একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন প্রতিটি মুক্তোই নাকি অত্যন্ত মূল্যবান এবং দুর্লভ— সহজে পাওয়া যায় না। এ-জাতের মুক্তো আপনি নিজে দেখলেই বুঝবেন সত্যিই সুন্দর কিনা।

বলতে বলতে একটা চেপটা বাক্স খুলে অত্যুৎকৃষ্ট ছ-টি মুক্তো দেখালেন মর্স্টান। জীবনে এ-রকম মুক্তো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

শার্লক হোমস বললে, আপনার বিবৃতি শুনে আমার কৌতুহল জাগ্রত হয়েছে। আপনাকে নিয়ে কিছু ঘটেছে কি?

হ্যাঁ, আজকেই ঘটেছে। এসেছি সেই কারণেই। আজ সকালে এই চিঠিটা পেলাম। আপনি নিজে পড়ে দেখুন।

ধন্যবাদ, হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে বললে হোমস। খামটাও দয়া করে দেবেন। লন্ডন এস-ডব্লিউ ডাকঘরের ছাপ, তারিখ, সাতই জুলাই! কোণে পুরুষের বুড়ো আঙুলের ছাপ— খুব সম্ভব ডাকপিয়োনের! সবচেয়ে ভালো জাতের কাগজ। এক প্যাকেট খামের দামই ছ-পেনি। চিঠিপত্রের কাগজ বাছাইয়ের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে স্বভাব। ঠিকানা নেই। আজ রাত সাতটায় লিসিয়াম থিয়েটারের বাইরে বাঁ-দিক থেকে তৃতীয় থামের গোড়ায় হাজির থাকবেন। ভরসা না-থাকলে সঙ্গে দু-জন বন্ধু আনবেন। অনেক অবিচার হয়েছে আপনার ওপর— এবার তার সুবিচার হবে। পুলিশ আনবেন না। আনলে বৃথা চেষ্টা জানবেন। আপনার অজ্ঞাত বন্ধু। বাঃ, এ তো দেখছি দারুণ রহস্য। কী করবেন ঠিক করেছেন, মিস মর্স্টান।

সেইটাই তো জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।

তাহলে চলুন যাওয়াই যাক। আমি, আপনি— আর হ্যাঁ, ড. ওয়াটসনও যাবেন সঙ্গে। পত্রলেখক দু-জন বন্ধুর কথা লিখেছে। আমরা দুই বন্ধু এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি।

কিন্তু উনি কি আসবেন? হাবেভাবে কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা মিনতি ফুটিয়ে তুলে বললেন ভদ্রমহিলা।

নিশ্চয় আসব, সানন্দে আসব, আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো কাজ হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব, বললাম গাঢ় কণ্ঠে।

আপনারা দু-জনেই বড়ো ভালো, বড়ো দয়ালু। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর থেকে আমার কোনো বন্ধু নেই যার কাছে মন খুলে কথা বলা যায়। ছ-টায় এলে আপনারা তৈরি থাকবেন তো?

তার বেশি দেরি করবেন না, বললে হোমস। আর একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে যান। এই চিঠি আর মুক্তোর বাক্সের গায়ে লেখা ঠিকানা কি একই হাতে লেখা?

ঠিকানাগুলো সঙ্গেই এনেছি, বলে গোটাছয়েক কাগজ এগিয়ে দিলেন মিস মর্সটান। মক্কেল হিসেবে সত্যি আপনি আদর্শ। যখন যা দরকার তা বোঝবার ক্ষমতা আপনার আছে। দেখা যাক এবার লেখাগুলো, কাগজগুলো টেবিলে বিছিয়ে শার্লক হোমস পর্যায়ক্রমে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলল এক কাগজ থেকে আরেক কাগজে।

হাতের লেখা লুকোনো হয়েছে ঠিকানা লেখবার সময়ে— কিন্তু চিঠি লেখবার সময়ে সে চেষ্টা হয়নি। একটু পরে— একই লোকের লেখা— কোনো সন্দেহ নেই। এই তো দেখুন না ছোটো হাতের c অক্ষরটা— শেষের দিকের টানটা একইরকম। শব্দের শেষের s টা দেখেছেন— একইভাবে পেঁচানো হয়েছে মাঝখানটা। ঠিকানার লেখা আর চিঠির লেখা লিখেছে একই ব্যক্তি, মিথ্যে আশ্বাস

দিতে চাই না মিস মর্স্টান, কিন্তু একটা কথা সোজাসুজি জানতে চাই। এই লেখার সঙ্গে আপনার বাবার হাতের লেখার কোনো মিল আছে কি?

একেবারেই না।

জানতাম তাই বলবেন। তাহলে ওই কথাই রইল, ঠিক ছ-টায় আসুন। কাগজগুলো দয়া করে রেখে যান— আর একবার মাথা ঘামাতে চাই। এখন তিনটে বাজে। আসুন তাহলে।

আসি, বলে উজ্জ্বল, সহৃদয় চোখে পর্যায়ক্রমে আমাদের দু-জনের মুখের পানে তাকিয়ে মিস মর্স্টান মুক্তোর বাক্স তুলে চালান করলেন বুকের মধ্যে এবং তরতরিয়ে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

জানলায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম তার পথের দিকে। রাস্তার ভিড় কাটিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলেছেন মিস মর্স্টান। দেখতে দেখতে ধূসর টুপি আর সাদা পালক বিন্দুর মতো হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম সহর্ষে, আশ্চর্য মেয়ে বটে— দেখলেই ভালো লাগে!"

হোমস কিন্তু এর মধ্যেই ফের পাইপ ধরিয়ে নিয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই চোখের পাতা অর্ধেক নামিয়ে বললে অবসন্ন কণ্ঠে, তাই নাকি? খেয়াল করিনি।

হোমস তুমি সত্যিই একটা যন্ত্রবিশেষ— একটা হিসেবের কল। মাঝে মাঝে তোমার মধ্যে এমন একটা ডাহা অমানুষিকতা ফুটে ওঠে যে বলবার নয়।

মৃদু হাসল শার্লক হোমস। বলল, ব্যক্তিগত গুণাবলি যেন বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না-করে— এই হল প্রাথমিক প্রয়োজন। আমার কাছে একজন মক্কেল একটা একক ছাড়া কিছুই নয়— সমস্যার নিছক একটা অংশ। আবেগ-টাবেগ মাথা চাড়া দিলে যুক্তির ধার ভোতা করে ছাড়বেই— আটকাতে পারবে না। গুলিয়ে যাবে বিশ্লেষণ চিন্তা, আমি জানি নিজের তিন ছেলে-মেয়েকে স্রেফ বিমার

টাকা পাওয়ার লোভে বিষ খাইয়ে মেরেছিল এমন একটি মহিলা কথাবার্তায় যে সত্যিই ভুবনমোহিনী। আবার এমন একজন ভদ্রলোককে জানি যাকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে– অথচ যিনি আড়াই-লাখ পাউন্ড খরচ করে বসে আছেন লন্ডনের দীনদরিদ্রের অবস্থা ফেরাবার জন্যে।

এ-কেসটা অবশ্য—

ব্যতিক্রমকে কখনো বরদাস্ত করি না আমি। ব্যতিক্রম নিয়মের উল্টো। হাতের লেখা থেকে চরিত্র নির্ণয় সম্পর্কে পড়াশুনা আছে? এই টানা লেখা দেখে লেখক সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?

লেখাটা স্পষ্ট এবং সাজানো, বললাম আমি। চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, কাজ কারবারের অভ্যেস আছে।

মাথা নাড়তে লাগল হোমস। বলল, লম্বা অক্ষরগুলো লক্ষ করো। অন্য অক্ষরগুলোর মাথা ছাড়িয়েছে বলে মনেই হয় না। D দেখে মনে হচ্ছে যেন, A, F তো নয়— যেন E চরিত্র যাদের দৃঢ়, যত জড়িয়ে-মড়িয়েই তারা লিখুক না কেন, লম্বা অক্ষরগুলো সবসময় স্পষ্ট করে লেখে— একটার সঙ্গে আর একটা গুলিয়ে যায় না। ছোটো হাতের K গুলোর মধ্যে চিত্তের দোলায়মান অবস্থা ফুটেছে, বড়ো হাতের অক্ষরগুলোর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ঠিকরে পড়ছে। একটু বেরোচ্ছি। বইপত্তর ঘাটতে হবে। এই বইটা পড়ে দেখ— এ-রকম আশ্চর্য বই আজ পর্যন্ত আর লেখা হয়নি। উইনউড রীডসয়ের— মানুষের আত্মবলি। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরছি।

বইখানা হাতে নিয়ে জানলায় বসলাম, মন কিন্তু উধাও হল বইয়ের পাতার আওতা থেকে। লেখকের দুঃসাহসিক ভবিষ্য-দর্শন ছেড়ে মন ছুটে গেল মিস মর্সটানের পেছনে— সেই মিষ্টি হাসি গভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর আর মাকড়সার জালের মতো তাকে জড়িয়ে ধরা বিচিত্র রহস্যের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রইল আমার অন্তর। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার সময়ে বয়স ছিল সতেরো— তার মানে বয়স

এখন সাতাশ— বড়ো মিষ্টি বয়স, কেননা ঠিক এই বয়ঃসন্ধিকালেই যৌবন হারায় তার আত্মসচেতনতা— অভিজ্ঞতার ভারে বিনম্র হয়ে আসে উদগ্র মদিরতা! ঠায় বসে আকাশপাতাল এইসব চিন্তা করতে করতে শেষকালে এমন সব বিপজ্জনক চিন্তাও উঁকিঝুকি মারতে লাগল মাথার মধ্যে যে দৌড়ে গিয়ে বসলাম টেবিলে এবং রোগ নিরূপণ বিদ্যার সর্বাধুনিক গ্রন্থখানি টেনে নিয়ে পাগলের মতো উলটে যেতে লাগলাম পাতার পর পাতা। সামান্য একটা ডাক্তার আমি— সেনাবিভাগ থেকে অবসর নেওয়া আর্মি সার্জন, একটা পা কমজোরি, ব্যাঙ্কের তবিলের জোর তার চাইতেও কম, সাহস তো আমার কম নয়? এইসব চিন্তা বিলাস প্রশ্রয় দেওয়া আমাকে তো সাজে না। মিস মর্সটান একটা নিছক একটা, একটা ভগ্নাংশ— ইমারত গড়তে গেলে অনেক ইটের একটি ইটের মতোই তিনিও সমাধান ইমারতের একটি অংশ ছাড়া কিছুই নয়। ভবিষ্যৎ আমার তমসাচ্ছন্ন হোক না কেন, পুরুষের মতোই তার সম্মুখীন হওয়া উচিত— আলেয়ার আলোর মতো মরীচিকা কল্পনা দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে আলোকময় করে তোলার প্রচেষ্টায় কোনো লাভ আছে কি?

৩। সমাধানের সন্ধানে

হোমস ফিরল সাড়ে পাঁচটায়। মেজাজ খুব শরিফ, উৎসাহ উদ্দীপনায় ঝকমক করছে চোখ-মুখ। এই হল শার্লক হোমস। কখনো বিষাদের মেঘে অন্ধকার, কখনো উত্তেজনার প্রসাদে ঝলমলে।

এ-কেসে খুব একটা রহস্য নেই, কাপে আমি চা ঢেলে দিতে কাপটা তুলে নিয়ে বললে ও: এখন শুধু একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার।

সে কী! রহস্য সমাধান করে ফেললে!

অতখানি বলাটা ঠিক হবে না। একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি— যা খুব ইঙ্গিতময়। অত্যন্ত ইঙ্গিতময়। বিশদভাবে ব্যাপারটাকে এবার জানা দরকার। টাইমস পত্রিকার পুরোনো ফাইল ঘাটতে গিয়ে দেখলাম থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যানন্ট্রির অবসর প্রাপ্ত অফিসার এবং আপার নরউডের বাসিন্দা মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮ এপ্রিল মরদেহ ত্যাগ করেছেন।

বুদ্ধি আমার খুবই মোটা হতে পারে, কিন্তু ভাই হোমস আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এ-খবরের মধ্যে কীসের ইঙ্গিত তুমি পেলে।

কী আশ্চর্য। বুঝলে না ব্যাপারটা? সত্যিই অবাক করলে আমাকে। বিষয়টাকে তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো। ক্যাপ্টেন মর্সটান অদৃশ্য হলেন। লন্ডন শহরে একজনের বাড়িতেই তিনি যেতে পারেন গল্পগুজব করার জন্যে— তিনি হলেন মেজর শোল্টো। কিন্তু মেজর শোল্টো সাফ বলে দিলেন– ক্যাপ্টেন মর্সটান লন্ডনে এসেছে কিনা তা-ই তিনি জানেন না। পাঁচ বছর পরে মারা গেলেন শোল্টো। মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন মর্সটানের মেয়ে একটা দামি উপহার পেলেন এবং প্রতি বছর একটা সময়ে আসতে লাগল সেই উপহার। অবশেষে এসেছে একটা চিঠি যাতে বলা হয়েছে ভদ্রমহিলার ওপর নাকি অবিচার করা হয়েছে। বাপের কাছ ছাড়া করা ছাড়া মেয়ের ওপর আর কী অবিচার হতে

পারে এক্ষেত্রে? শোল্টোর মৃত্যুর ঠিক পর থেকে উপহার দেওয়া শুরু হল কেন? শেল্টোর উত্তরাধিকারী কি তাহলে জানত যে মর্সটানের মেয়ের উপর গুরুতর অবিচার করা হয়েছে? তাই তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ বছর বছর মুক্তো পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে? বলো ভায়া এ ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা মাথায় এসে থাকলে বলে ফ্যালো।

কিন্তু এই কি একটা ক্ষতিপূরণ হল! একী অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত! তা ছাড়া চিঠিটা ছ-বছর আগে না-লিখে এখনই-বা লিখতে গেল কেন? ফ্যাকড়া আরও আছে। চিঠিতে বলা হয়েছে অবিচারের সুবিচার এবার হবে। কিন্তু সুবিচারটা কী ধরনের? এত বছর পরে আশা করা যায় না পিতৃদেব বেঁচে আছেন। মিস মর্সটানের কেসে এ ছাড়া আর কি কোনো অবিচার তোমার জানা নেই।

চিন্তামগ্নভাবে হোমস বললে, আছে আছে, অনেক অসুবিধেই আছে। আজ রাতে অভিযানের পর দেখবে, কিছু অসুবিধে দূর হয়েছে। ওই তো এসে গেল চার চাকার গাড়ি— ভেতরে দেখা যাচ্ছে মর্সটানকে। তুমি তৈরি? তাহলে চলো নেমে যাওয়া যাক। ছ-টা বেজে গেছে।

আমি টুপি আর সবচেয়ে ভারী ছড়ি নিলাম। হোমস কিন্তু ড্রয়ার থেকে রিভলবার বের করে চালান করল পকেটে। পরিষ্কার বোঝা গেল, নৈশ অভিযানে ঝামেলার আশঙ্কা করছে শার্লক হোমস।

কালো আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ মুড়ে বসেছিলেন মিস মর্সটান। ভাবপ্রবণ মুখটি সংযত কিন্তু বিবর্ণ। বিবর্ণ না-হলেই বরং অবাক হতাম। অদ্ভূত অভিযানে পা বাড়িয়ে কোনো মহিলা যদি অস্বস্তি অনুভব না-করেন, তাহলে তাকে শুধু মহিলা ছাড়াও অন্য কিছু বলতে হয়, অস্বস্তি সত্ত্বেও মিস মর্সটানের আত্মসংযমে কিন্তু ত্রুটি নেই। হোমসের প্রশ্নগুলোর উত্তরও দিয়ে গেল ঝটপট।

মেজর শোল্টো বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রত্যেকটা চিঠিতে মেজরের উল্লেখ থাকত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন উনি এবং বাবা

দু-জনেই– সেইজন্যেই অত অন্তরঙ্গতা। ভালো কথা, বাবার টেবিলে একটা অদ্ভুত কাগজ পাওয়া গিয়েছিল— মাথামুণ্ডু কেউ বুঝতে পারেনি। সঙ্গে করে এনেছি যদি আপনি দেখতে চান, যদিও জানি এ-কাগজের কোনো গুরুত্বই নেই, এই দেখুন।

সন্তপর্ণে কাগজটার ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল হোমস। তারপর বেশ পদ্ধতি মাফিকভাবে দেখতে লাগল কনভেক্স লেন্স দিয়ে।

মন্তব্য করল এইভাবে, নেটিভ পেপার— ভারতবর্ষে তৈরি। এক সময়ে একটা বোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো ছিল। নকশাটা একটা প্রকাণ্ড বাড়ির— পুরো বাড়ির নয়— একটা অংশের। অনেক হল ঘর, অনেক বারান্দা, অনেক গলিপথ। একদিকে লালকালি দিয়ে আঁকা ছোট্ট ক্রস চিহ্ন। তার ঠিক ওপরেই ফিকে-হয়ে যাওয়া পেনসিলের লেখা— বাঁ-দিক থেকে ৩০ ৩৭। বাঁ-দিকের কোণে অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্ন। একই লাইনে চারটে ক্রস— যেন হাতে হাত ছুঁয়ে রয়েছে। এর পাশে লেখা, চারের সংকেত— জোনাথন স্মল, মাহোমেত সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর। হাতের লেখা রীতিমতো গোদা গোদা, ধ্যাবড়া টাইপের। হার মানলাম। হাতের কেসের সঙ্গে এ-কাগজের কোনো সম্পর্ক দেখছি না। তা সত্ত্বেও বলব কাগজটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল— তাই সযত্নে পকেট বইয়ের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল— কেননা কাগজের দু-পাশই বেশ পরিষ্কার।

বাবার পকেটে বইয়ের মধ্যেই পেয়েছিলাম কাগজখানা।

যত্ন করে রেখে দিন মর্স্টান। হয়তো কাজে লাগতে পারে। ব্যাপারখানা শেষ পর্যন্ত আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়াতে পারে— এ-রকম একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে আমার মনের মধ্যে। প্রথমে কিন্তু ভাবিনি এ-কেসে এত সূক্ষ্মতা থাকতে পারে। ভাবনাগুলোকে নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

এই বলে গাড়ির আসনে হেলান দিয়ে বসল হোমস। শূন্য দৃষ্টি আর টান-টান মুখচ্ছবি দেখেই বুঝলাম গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। বর্তমান অভিযান এবং অভিযানে ফলাফল কী হতে পারে– এই নিয়ে নিম্নকণ্ঠে কথা বলতে লাগলাম

আমি আর মিস মসটান। বন্ধুবর হোমস কিন্তু গন্তব্যস্থানে না-পৌছানো পর্যন্ত মুখ গোমড়া করে বসেই রইল– চিন্তার আবরণ ভেদ করা গেল না কিছুতেই।

সেপ্টেম্বরের রাত... সাতটা তখনও বাজেনি। কিন্তু সারাদিনটা বড়ো একঘেঁয়ে বিষনণ্ণতায় কেটেছে– এখন গাঢ় কুয়াশা আস্তে আস্তে গ্রাস করছে বিশাল শহরটিকে, কাদারঙের মেঘ যেন মুখ কালো করে ঝুলছে কাদাটে রাস্তার ওপর। রাস্তার দু-ধারে ল্যাম্পপোস্ট থেকে অতি ক্ষীণ আলোর আভা চক্রাকারে পড়েছে কাদা প্যাঁচপেঁচে ফুটপাথে। দোকান-পসারির জানলা থেকে হলদেটে দ্যুতি বাষ্পময় বাতাসের মধ্যে দিয়ে তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে বটে, কিন্তু জনবহুল পথে তার ঘোর অস্পষ্ট, ক্রমাগত চঞ্চল আভায় পর্যবসিত হয়েছে। এইসব আলোক বিচ্ছুরণের মধ্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে সারি সারি মুখ- যেন প্রেতের মুখ। অলৌকিক এই পরিবেশে অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে। শেষ নেই মুখের সারির। সংকীর্ণ আলোক পরিসরে যেন শোভাযাত্রা করে যাচ্ছে ভূতুড়ে মুখগুলো– কেউ হাস্যমুখর, কেউ বিষাদগ্রস্ত, কেউ উদ্ভ্রান্ত, কেউ প্রসন্ন। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে ফের মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে– নরলোকের যা নিয়ম। ছায়া দেখে চমকে ওঠা বা ভাবনা শুরু করে দেওয়া আমার ধাতে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই রাতটা যেন কেমনতরো। বিষণ্ণ, মন্থর, গুরুভার। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো চলেছি একটা অত্যদ্ভুদ কাজের দায়িত্ব নিয়ে। সব মিলিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, মনটাও খুব দমে গিয়েছিল। মিস মর্সটানের মুখ দেখে আঁচ করলাম যে ভদ্রমহিলাও আমারই মতো মানসিক বিকারে ভুগছেন। এসব তুচ্ছ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মতো শান্ত ধাতু শুধু একজনেরই ছিল আমাদের মধ্যে– শার্লক হোমসের। এদিক দিয়ে সে আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। নোটবই হাঁটুর ওপর মেলে ধরে পকেট লণ্ঠনের আলোয় মাঝে মাঝে সে নানারকম হিসেব আর কথা লিখে রাখছে পাতার পর পাতায়।

লিসিয়াম থিয়েটারে পৌঁছে দেখি দু-পাশের প্রবেশপথের সামনে এর মধ্যেই ভিড় জমেছে! সামনের দিকে গাড়ি আর গাড়ি। আসছে, দাঁড়াচ্ছে, শার্ট পরা পুরুষ আর শাল গায়ে হিরেমোড়া মহিলারা নামছেন, ভাড়া গুনে দিচ্ছেন, গাড়ি চলে যাচ্ছে। তৃতীয় থামটার সামনে আসতে বলা হয়েছিল চিঠিতে! পৌঁছোলোম সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ানের বেশধারী একজন খর্বকায়, কৃষ্ণকায়, চটপটে লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

আপনারা কি মিস মর্সটানের সঙ্গে এসেছেন?

আমি মিস মসটান। এই দুই ভদ্রলোক আমার বন্ধু।

আশ্চর্য রকমের অন্তর্ভেদী সপ্রশ্ন চোখে আমাদের পানে তাকাল লোকটি। বলল একগুয়ে গলায়, কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমার ওপর হুকুম আছে আপনাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়ার– কথা দিন এরা পুলিশের লোক নন।

'কথা দিলাম' , বললেন মিস মর্সটান। তীক্ষ্ণ শিস দিল লোকটা। সঙ্গেসঙ্গে রাস্তার এক উঞ্চ ছোকরা একখানা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে, খুলে ধরল দরজা। যে-লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল আমাদের সঙ্গে– উঠে বসল চালকের জায়গায়। আমরা বসলাম ভেতরে। বসতে-না-বসতেই চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কোচোয়ান। দুর্দান্ত বেগে কুয়াশার মধ্য দিয়ে আমরা ধেয়ে চললাম অজানার উজানে।

পরিস্থিতি খুবই বিচিত্র। কোথায় চলেছে গাড়ি– জানি না; কী উদ্দেশ্যে চলেছে– তাও জানি না। আমন্ত্রণটা হয় স্রেফ ধাপ্পা– অবশ্য তা কল্পনা করাও যায় না– অথবা সত্যিই আমরা এগিয়ে চলেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির অভিমুখে। মিস মর্সটানের আচরণ আগের মতো সংযত, দৃঢ়। আফগানিস্তানের স্মৃতিকথা শুনিয়ে ভদ্রমহিলাকে প্রসন্ন এবং প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী আমি নিজেই বিচিত্র পরিস্থিতির দরুন এখন উত্তেজিত আর কোথায় যাচ্ছি ভেবে এত কৌতুহলী হয়েছিলাম যে গল্প শুনিয়ে খুব একটা সুবিধে করতে

পারলাম না। আজও ওঁর মুখেই শুনি সেদিন গল্প বলতে গিয়ে বলেছিলাম গভীর রাতে একটা দোনলা বন্দুক আমার তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়েছিল বলে নাকি আমি একটা বাঘের বাচ্চা ছুড়েছিলাম টিপ করে। প্রথম প্রথম ঠাহর করতে পারছিলাম যাচ্ছি কোনদিকে, কী রাস্তায়। তারপর সব গুলিয়ে গেল! একে তো লন্ডনের পথঘাট আমি তেমন চিনি না, তার ওপর নক্ষত্রবেগে কুয়াশা ফুঁড়ে ওইভাবে ধেয়ে চলা– তাই কোনদিকে যাচ্ছি খেয়াল রাখতে পারলাম না। শুধু মনে আছে দূরে. উল্কাবেগে চলেছে অশ্বযান। শার্লক হোমসের মাথা কিন্তু গুলোয়নি। গলিখুঁজি, রাজপথ, বাগান, চত্বর– যেখান দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে প্রতিটার নাম বলে যাচ্ছে আপন মনে।

রোচেস্টার রো, এবার ভিনসেন্ট স্কোয়ার। ভক্সহল ব্রিজ রোড এসে গেল দেখছি। মনে হচ্ছে সারের দিকে যাচ্ছি। যা ভেবেছি, তাই। এইতো এবার ব্রিজে উঠলাম। ওই দ্যাখো নীচে নদী দেখা যাচ্ছে।

সত্যি টেমস নদীর জল দেখতে পেলাম! শান্ত, প্রশান্ত জলধারার ওপর চকচক করছে লণ্ঠনের আলো। দেখতে দেখতে নদী পেরিয়ে গাড়ি এল ওপারে– আবার ঝড়ের মতো ছুটতে লাগল রাস্তাঘাটের গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে।

শার্লক হোমসের ধারাবিবরণীও শুরু হয়ে গেল সঙ্গেসঙ্গে– ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড ! প্রায়রি রোড! লারখাল লেন! স্টকওয়েল প্লেস! রবার্ট স্ট্রিট, কোল্ড হারবার লেন। খুব একটা খানদানি পাড়ায় যাচ্ছি বলে তো মনে হচ্ছে না!

বাস্তবিকই এমন একটা পল্লি দিয়ে তখন গাড়ি ছুটছে যেখানকার সুনাম সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। নিষিদ্ধ পল্লি হওয়াও বিচিত্র নয়। সারি সারি কালচে ইঁটের বাড়ির মাঝে মাঝে কোণের দিকে পাঁচজনের মেলামেশার পাবলিক হাউসের ঝলমলে আলোগুলোই কেবল যা চোখে পড়ছে। তারপরেই আবির্ভূত হল সারি সারি দোতলা ভিলা– সামনে বাগান। পরক্ষণেই পূনরার্ভূত হল নতুন ইটের তৈরী কটমট করে তাকিয়ে থাকা রাক্ষসের মতো বাড়ির পর বাড়ি– যেন

অসংখ্য দানবিক কিলবিলে শুঁড় আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে রেখেছে বিশাল লন্ডন শহরের উপান্তকে। এর পরে ঘড়ঘড় শব্দে গাড়ি ঢুকল একটা নতুন রাস্তায়– থামল তৃতীয় বাড়িটার সামনে। আর সব বাড়ি খালি। যে-বাড়ির সামনে থামলাম, সেবাড়ির চেহারাও বাসিন্দাদের চেহারার মতো কালো– টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে কেবল রান্নাঘরে। দরজায় টোকা মারতেই পাল্লা খুলে দিল একজন হিন্দু চাকর। মাথায় হলদে পাগড়ি, গায়ে ঢিলে ঢালা পোশাক, কাঁধে হলদে উড়নি। মফস্‌সলের তৃতীয় শ্রেণির এই বসতবাড়ির দরজায় ফ্রেমে আবির্ভূত বিচিত্র প্রাচ্য মূর্তিটির মধ্যে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত অসংগতি রয়েছে– ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

সাহেব বসে আছেন আপনাদের পথ চেয়ে, কথা তার শেষ করার আগেই ভেতর বাড়ি থেকে ধ্বনিত হল একটা তীক্ষ্ণ সুর, কর্ণবিদারী কণ্ঠস্বর!

খিদমতগার, ভেতরে নিয়ে এসো ওঁদের– সোজা আমার কাছে।

৪। টেকো লোকটির কাহিনি

ভারতীয় ভৃত্যের পেছন পেছন ঢুকলাম একটা টানা লম্বা গলিপথে। আলো খুব কম। অত্যন্ত নোংরা। আসবাবপত্রও যাচ্ছেতাই। ডান দিকের একটা দরজা ঠেলে খুলে দিতেই এক ঝলক হলদে আলো আছড়ে পড়ল আমাদের ওপর। আলোক বন্যার মাঝে দাঁড়িয়ে ছোটোখাটো চেহারা এক পুরুষ। মাথাটি অত্যন্ত উঁচু। কিনারা ঘিরে গুচ্ছ গুচ্ছ লালচে চুল। শীর্ষদেশ কেশহীন চকচকে। ঝাউগাছের মাথা ছাড়িয়ে যেন উঁচু হয়ে রয়েছে পাহাড়ের চুড়ো। দু-হাত ঘষে, সারাশরীরটাকে ঘন ঘন নাচিয়ে ঝাঁকিয়ে, কখনো হেসে ভ্রকুটি করে এক লহমার জন্যেও সুস্থিত হতে পারছিল না লোকটা! সবকিছুই হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। প্রকৃতির খেয়ালে তার ঠোঁটজোড়া পেণ্ডুলামের মতো দুলন্ত এবং দু-সারি দাঁতও বেখাপ্পাভাবে উঁচুনীচু এবং হলদেটে নোংরা। দাঁত আর ঠোঁটে এহেন ছিরি ঢাকবার প্রয়াসে মাঝে মাঝে হস্তচালনা করছে মুখের নীচের দিকে। যাচ্ছেতাই ওই টাক সত্ত্বেও লোকটার চেহারায় কিন্তু যৌবনের ছাপ। প্রকৃতপক্ষে বয়স তার তিরিশও ছাড়ায়নি।

তীক্ষ্ণ সরু বাঁশির মতো গলায় বললে সে, আসুন মিস মর্সটান, আপনার খানসামার ঘরেই আসুন। জেন্টলমেন, আসুন আপনাদের ভৃত্যের ঘরে। এই আমার সাধের ঘর– ছোট্ট– কিন্তু সাজিয়েছি আমার মতন করে। দক্ষিণ লন্ডনের ধু-ধু মরুভূমির মাঝে এক টুকরো মরুদ্যান বলতে পারেন।

ঘরের চেহারা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম আমরা প্রত্যেকেই। প্রথম শ্রেণির হিরে যদি তামার সেটিংয়ে থাকে, তাহলে তা যেমন বেমানান, শ্রীহীন এই ভবনের এই ঘরখানিও তেমনি খাপছাড়া। অত্যন্ত দামি আর অত্যন্ত চকমকে পর্দার পর পর্দা ঝুলছে দেওয়ালে দেওয়ালে, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে খানকয়েক অত্যন্ত দামি ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্র অথবা প্রাচ্য ফুলদানি। কার্পেটটা

তৈলস্ফটিক হলুদ হলুদ আর কালো রঙের– এত নরম আর পুরু যে মোলায়েমভাবে পা তলিয়ে যায় নীচে- যেন পা পড়ছে শৈবালস্তরে। এহেন গালচের ওপর পাতা দুটো প্রকাণ্ড সমুণ্ড বাঘের ছাল– প্রাচ্য বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন– এক কোণে মাদুরের ওপর রাখা বিশাল হুকোটাও এই বিলাসিতার আর একটি অঙ্গ। প্রায় অদৃশ্য সোনার সুতো থেকে ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে একটা রুপের পায়রা– আসলে একটা লম্ফ– পায়রার আকারে তৈরি। সলতে জ্বলছে, তেল পুড়ছে এবং ভারি মিষ্টি আর অতীব হালকা একটা প্রাণমাতানো সুবাসে ম-ম করছে ঘরের বাতাস।

সমগ্র শরীর ঝাঁকিয়ে, হেসে বললে খুদে লোকটা, আমার নাম থেডিয়াস শোল্টো। আপনি নিশ্চয় মিস মর্সটান। আর এই ভদ্রলোক দু-জন–

ইনি মি. শার্লক হোমস, আর ইনি ডাক্তার ওয়াটসন।

ডাক্তার? বিলক্ষণ উত্তেজনা জাগে থেডিয়াস শোল্টোর কণ্ঠে, স্টেথোস্কোপ আছে? একটা অনুরোধ করতে পারি? হৃৎপিণ্ডের মিরট্যাল ভালবটা নিয়ে বড়ো দুশ্চিন্তা আছে আমার। দয়া করে যদি একটু দেখে দেন। অ্যাওরটিকের ওপর ভরসা আছে– নেই কেবল এই মিরট্যালের ওপর। আপনার মতামত পেলে বর্তে যেতাম।

অনুরোধ রাখলাম। কান পেতে হৃৎপিণ্ডের বাজনা শুনলাম। গোলমাল কোথাও দেখলাম না– ভয় ছাড়া। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে লোকটা– আপাদমস্তক কাঁপছে ঠকঠক করে।

বললাম, ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। ভয়ের কারণ নেই।

মিস মর্সটান, লঘু সুরে বললে শোল্টো, আমার উদবেগকে ক্ষমার চোখে দেখবেন। অনেক কষ্ট পেয়েছি জীবনে– মিরট্যাল ভালবটা নিয়ে বরাবর দারুণ সন্দেহ ছিল মনে। ভয়ের কারণ নেই শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মিস মর্সটান,

হৃৎপিণ্ডের ওপর বাড়তি ধকল যদি কমাতে পারতেন আপনার বাবা, বাঁচলেও বাঁচতে পারতেন আজও!

আমার ইচ্ছে হল কষে একটা চড় মারি লোকটার গালে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল আহাম্মুকি দেখে! এইরকম হৃদয়-ছোওয়া একটা বিষয় নিয়ে এভাবে কেউ কথা বলে? ক্যাবলা কোথাকার! মিস মর্স্টান দেখলাম আস্তে আস্তে বসে পড়লেন, সাদা হয়ে গেল ঠোঁট, মুখ– সমস্ত!

আমি জানতাম। মনে মনে জানতাম বাবা আর নেই!

সব খবরই পাবেন আমার কাছে, সেই সঙ্গে পাবেন সুবিচার, তাতে বার্থোলোমিউ ভায়া চটে গেলেও থোড়াই কেয়ার করি। বন্ধুদের এনে ভালোই করেছেন। খুব খুশি হয়েছি। কেননা, শুধু আপনার পথসঙ্গই নন, এখন যা বলব এবং করব– তার সাক্ষীও বটে। তিন জনে রুখে দাঁড়াতে পারব বার্থোলোমিউ ভায়ার সামনে। কিন্তু বাইরের লোক না-থাকাই ভালো– পুলিশ-টুলিশ একদম বাদ। কারোর নাক গলানোর দরকার নেই– নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবখন। ঢক্কা নিনাদ বস্তুটা দু-চক্ষে দেখতে পারে না বার্থোলোমিউ ভায়া। বলতে বলতে একটা নীচু সোফায় বসল শোল্টো এবং ছলছল নীল দুর্বল চোখে জিজ্ঞাসার ঢংয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে– ঘন ঘন পড়তে লাগল চোখের পাতা।

হোমস বললে, আমার দিক দিয়ে বলতে পারি, যা বলবেন তা আর কেউ জানবে না।

ওতেই হবে! মিস মর্স্টান, চিয়ানতি দেব নাকি এক গেলাস? টোকে? আর কোনো মদ রাখি না। ফ্লাস্ক খুলব? না? বেশ, বেশ, তামাকের গন্ধে নিশ্চয় আপত্তি করবেন না– খাসা গন্ধ কিন্তু– প্রাচ্যের তামাক তো, স্নায়ু ঠান্ডা করতে জুড়ি নেই। আমি আবার একটু নার্ভাস টাইপের– একটুতেই ঘাবড়ে যাই– হুকোটাই আমার একমাত্র ঘুমের ওষুধ।

সরু মোমবাতি দিয়ে টিকের আগুন ধরিয়ে নিল শোল্টো। ক্ষণপরেই গুরুক গুরুক শব্দে বুদবুদ কেটে ধোয়া বেরিয়ে এল গোলাপজলের মধ্যে দিয়ে। গালে হাত দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে রইলাম আমরা তিনজন– চকচকে উন্নত মাথা দিয়ে শরীরে ঘন ঘন ঝাঁকুনি জাগিয়ে ঠিক মাঝখোনে বসে গুরুক গুরুক করে পরম অস্বস্তির সঙ্গে আলবোলা টেনে চলল বিচিত্র ব্যক্তিটি।

তারপর বললে, প্রথমে যখন ঠিক করলাম আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তখনই কিন্তু আমার ঠিকানা সরাসরি জানিয়ে দিতে পারতাম আপনাদের। কিন্তু ভয় হয়, যদি আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলে অবাঞ্ছিত লোকেদের নিয়ে হামলা জোড়েন বাড়ির মধ্যে? সেইজন্যে একটু হুঁশিয়ার হতে হল। এমনভাবে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার লোক উইলিয়ামস আগে দেখতে পায় আপনাদের। ওঁর বুদ্ধি-শুদ্ধির উপর আমার অগাধ আস্থা। বলেও রেখেছিলাম, যদি তেমন বোঝে তাহলে যেন আর না-এগোয়। আমার এত সাবধানতা দয়া করে ক্ষমার চোখে দেখবেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন, অবসর জীবনযাপন করি– রুচিও উঁচুদরের– মোটাদরের নয় মোটেই। পুলিশের লোকের মতো নীরস গদ্যবৎ বস্তু দুনিয়ায় আর দু-টি নেই- সূক্ষ্মতা বা শিল্পের ধার দিয়েও যায় না। স্থূল সইতে পারিনে একদম, রক্তের মধ্যে বাধা আছে। পাঁচজনের স্থূল জটলার মধ্যেও পারতপক্ষে যাই না। দেখতে পাচ্ছেন খানদানি পরিবেশে থাকতে ভালোবাসি। নিজেকে শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষকও বলি। এ হল আমার দুর্বলতা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের তৈলচিত্রটা, আসল কোরো, ওই যে স্যালভেটর রোসা দেখছেন- খুঁতখুঁতে সমালোচকের সন্দেহ হলেও ওটাও কিন্তু আসল, বুগুরা সম্বন্ধেও সংশয় রাখবেন না মনে। আধুনিক ফরাসি ছবির দিকেই আমার ঝোঁক বেশি।

মি. শোল্টো, বললেন মিস মর্সটান, আমি এসেছি কিন্তু আপনার কী বলার আছে শোনবার জন্যে। রাত অনেক হল, সংক্ষেপে সারুন।

যত সংক্ষেপেই করি না কেন, সময় কিছু লাগবে। কেননা, নরউডে গিয়ে ব্রাদার বার্থোলোমিউয়ের সঙ্গে দেখা না-করলেই নয়। দল বেঁধেই যাব, তাতে যদি পথে আনা যায় ব্রাদার বার্থোলোমিউকে। আমি যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি, বলে দারুণ গোসা হয়েছে ভায়ার। কাল রাতে খুব কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে এই নিয়ে। কল্পনা করতে পারবেন না রেগে গেলে কী সাংঘাতিক লোক হয়ে যায় আমার এই ব্রাদারটি!

আমি সাহস করে বলে ফেললাম, নরউডেই যদি যেতে হয়, তাহলে এখুনি বেরোনোই ভালো।

হেসে উঠল খুদে শোল্টো, হাসতে হাসতে টকটকে লাল করে ফেলল কানের ডগা পর্যন্ত।

বললে উচ্চকণ্ঠে, তাতে ফল হবে না। হঠাৎ এইভাবে আপনাদের নিয়ে হাজির করলে কী বলতে কী বলে বসবে ভগবান জানেন। পরিস্থিতিটা আগে বোঝাতে দিন– আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেটা পরিষ্কার করতে দিন। প্রথমেই বলে রাখি আমার কাহিনির বেশ কয়েকটা ব্যাপার আমার কাছেও আজ পর্যন্ত ধোঁয়াটে। যা জানি শুধু তাই বলব– ঘটনা ছাড়া তার মধ্যে কিছু নেই।

বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় আমার বাবা মেজর শোল্টো এককালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে চলে এলেন আপার নরউডে– উঠলেন পণ্ডিচেরী লজে। ভারতবর্ষে থাকতে থাকতে অনেক টাকা করেছিলেন উনি। দেশে ফিরলেন কুবেরের সম্পদ নিয়ে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, দামি দুষ্প্রাপ্য বস্তুর এক বিরাট দুর্লভ সংগ্রহ আর একদল ওই দেশের চাকরবাকর। এত সুবিধে থাকার ফলেই বাড়ি কেনা সম্ভব হয়েছিল এবং সেই থেকেই অত্যন্ত বিলাসবহুলভাবে বসবাস শুরু করলেন পণ্ডিচেরী লজে। আমি আর আমার বার্থোলোমিউ ব্রাদার ছাড়া তার আর ছেলেপুলে নেই।

ক্যাস্টেন মর্স্টনের চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধানের পর কাগজে কাগজে কী লেখা হয়েছিল সব মনে আছে আমার! হইচই পড়ে গিয়েছিল সারাদেশে। বাবার বন্ধু বলেই বাবার সামনেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতাম খোলাখুলিভাবে। শেষপর্যন্ত এর অদৃষ্টে কী ঘটতে পারে এই নিয়ে অনেকরকম অনুমান করতাম, বাবাও যোগ দিতেন কথায়। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি গোটা রহস্যটাই উনি পেটের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছেন। ভাবতেও পারিনি উনি ছাড়া আর কেউ জানে না কী ঘটেছে মর্স্টানের অদৃষ্টে।

এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে দারুণ একটা রহস্য, অমোঘ একটা বিপদ ঝুলছে আমার বাবার মাথায়। একলা কখনো রাস্তায় বেরোতেন না। বাজি ফেলে লড়াই করে, এমন দু-জন প্রাইজ ফাইটার মুষ্টিযোদ্ধাকে পণ্ডিচেরী লজে কুলির চাকরি দিয়ে রেখেছিলেন। আজকে আপনাদের গাড়ি চালিয়ে আনল যে উইলিয়ামস, সে দু-জনের একজন। এককালে ইংল্যান্ডের লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিল উইলিয়ামস। ভয়টা কীসের অথবা কাকে, বাবা কখনো বলেননি। তবে লক্ষ করেছি তার চক্ষুশূল ছিল কাঠের পা-আলা কোনো ব্যক্তি। একবার কাঠের পা-আলা একজন দেখেই উনি রিভলবার ছুড়েছিলেন। শেষকালে দেখা গেল লোকটা একটা নিরীহ ফেরিওয়ালা। বাড়ি বাড়ি যায় অর্ডার সংগ্রহ করতে। অনেক টাকা ছড়িয়ে ধামাচাপা দিয়েছিলাম সেই কেলেঙ্কারি। ভায়া আর আমি দু-জনেই তখন ভাবতাম এটা বুঝি বাবার একটা বদখেয়াল– পরে কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে এ-ধারণা পালটাতে বাধ্য হয়েছি।

১৮৮২ সালে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে সাংঘাতিক মানসিক চোট পেলেন বাবা। প্রাতরাশ খেতে বসেছিলেন টেবিলে। চিঠিখানাও খুলেছিলেন সেখানে– অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন টেবিলের ওপর। তারপর থেকেই কালব্যাধি পেয়ে বসল বাবাকে– তিলতিল করে এগিয়ে চললেন মৃত্যুর দিকে। কী লেখা ছিল চিঠিতে কাউকে বলেননি বাবা। তবে পাশ থেকে লক্ষ করেছিলাম চিঠির

হস্তাক্ষর জড়ানো ধরনের। পিলে বৃদ্ধির জন্য অনেকদিন ধরেই কষ্ট পাচ্ছিলেন বাবা। এই ঘটনার পর দ্রুত বেড়ে গেল রোগের প্রকোপ। এপ্রিলের শেষের দিকে শুনলাম জীবনের আশা নেই এবং শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন আমাদের– কী যেন বলতে চান মৃত্যুর আগে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসে হাপরের মতো নিশ্বাস নিচ্ছেন বাবা! ইশারায় দরজায় তালা দিয়ে বিছানার দু-পাশে এসে বসতে বললেন দু-জনকে। তারপর আমাদের হাত চেপে ধরে যন্ত্রণায় আর আবেগে ভাঙা ভাঙা স্বরে যা বললেন যদ্দূর সম্ভব তা শোনাবার চেষ্টা করব আপনাদের।

'মরতে বসেছি, কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না– পাষাণ হয়ে চেপে রয়েছে আমার বিবেকের ওপর। মর্স্টানের অনাথ মেয়েটাকে আমি পথে বসিয়েছি। খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি বেচারার সঙ্গে। যে অভিশপ্ত লোভের বশবর্তী হয়ে এক মহাপাপের বোঝা টেনে চলেছি জীবনভোর, সেই লোভের ফাঁদে পড়েই মেয়েটাকে ফাঁকি দিয়েছি অর্ধেক দৌলত– ধনরত্নের অন্তত অর্ধেকের মালিকানা হওয়া উচিত ওর। অথচ সে-সম্পদ নিজেও যে ভোগ করেছি তা নয়– আগলে রেখেছি যখের মতো– সাধে কি বলে অতিরিক্ত ধনলিপ্সায় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, নির্বোধ হয়ে যায়। কুবেরের সম্পদ দখলে রাখার আনন্দেই মাতোয়ারা হয়ে আর একজনকে বাবার অংশ দিতেও চাইছি না। কুইনাইনের শিশির পাশে মুক্তোর মুকুটটা দেখেছ? এ-মুকুট ওকে দেওয়ার জন্যেই সঙ্গে এনেছিলাম– কিন্তু দিচ্ছি না। কাছ ছাড়া করতেও প্রাণ চাইছে না। শোন, ছেলেরা, আগ্রা দৌলতের বেশ কিছু বখরা মেয়েটাকে দিয়ো। কিন্তু আমি না-যাওয়া পর্যন্ত কিছু দেবে না– মুকুটটাও না। এ-রকম কাহিল অবস্থায় পৌঁছেও মানুষ সেরে ওঠে– বেঁচে যায়।

শোনো বলি কীভাবে মারা গিয়েছিল মর্স্টান। ওর হার্ট চিরকালই দুর্বল– কিন্তু কেউ জানত না– কাউকে বলত না– আমাকে ছাড়া! আমিই কেবল জানতাম

ওর হৃৎপিণ্ড ধকল সইতে পারে না একদম। ভারতবর্ষে থাকার সময়ে পর পর অনেকগুলো আশ্চর্য ঘটনার ফলে বেশ কিছু ধনরত্ন হাতে আসে আমাদের দু-জনের। আমি তা নিয়ে আসি ইংল্যান্ডে। মর্স্টান দেশে ফিরেই সেই রাতেই সোজা আমার এখানে এসে চাইল অর্ধেক বখরা। স্টেশন থেকে হেঁটে এসেছিলেন মর্স্টান– দরজা খুলে দিয়েছিল লাল চৌদার– আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী চাকর– এখন সে-ও পরলোকে। মণিমুক্ত বখরা করা হবে কীভাবে, এই নিয়ে মতান্তর হল আমার সঙ্গে মর্স্টানের। বেশ কিছু চেঁচামেচিও হয়ে গেল তাই নিয়ে! রাগের মাথায় চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়েছিল মর্স্টান। আচমকা বুকের বাঁ-দিকে খামচে ধরে টলতে লাগল মাতালের মতো; ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে এল মুখ, তারপরেই চিতপটাং হয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর, দড়াম করে মাথাটা ঠুকে গেল রত্নপেটিকায়। দৌড়ে গেলাম আমি। হেট হয়ে সভয়ে দেখলাম মারা গিয়েছে মর্স্টান।

মুহ্যমানের মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ, ঠিক করে উঠতে পারলাম না কী করা উচিত এখন। প্রথমে ভেবেছিলাম চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি। কিন্তু যদি সবাই উলটে সন্দেহ করে বসে যে আমিই হিরে মুক্তোর লোভে খুন করেছি মসটানকে? দুটো কারণে লোকের সন্দেহ এসে পড়বে আমার ওপর– প্রথমত দারুণ চেঁচামেচির পরেই মৃত্যু। দ্বিতীয়ত রত্নপেটিকার কোণে লেগে মাথা কেটে যাওয়া। দুটো ব্যাপারই যাবে আমার বিরুদ্ধে! আরও আছে। পুলিশ এলে সরকারি তদন্ত হবেই। রত্নপেটিকার গুপ্ত সংবাদও ফাঁস হয়ে যাবে– যা আমি মোটেই চাই না। মর্স্টান বলেছিল কাকপক্ষীও জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। সুতরাং খবরটা কাকপক্ষীকে গায়ে পড়ে জানানোর দরকার নেই।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময়ে চোখ তুলে দেখি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার চাকর লাল চৌদার। পা টিপে টিপে ভেতরে এসে দরজায় খিল তুলে দিল সে। বললে, ভয় কী সাহেব? কেউ জানবে না আপনি খুন করেছেন

ওঁকে। আসুন, লাশটা লুকিয়ে ফেলি। আমি বললাম, আমি খুন করিনি। হাসল লাল চৌদার। মাথা নেড়ে বললে, সাহেব, আড়াল থেকে সব শুনেছি আমি। ঝগড়া শুনেছি, মাথায় মারার আওয়াজও শুনেছি, কিন্তু এই মুখে চাবি দিলাম– কেউ তা জানবে না। বাড়িসুদ্ধ লোক এখন ঘুমোচ্ছে। এই সুযোগ। চলুন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক দেহটা। শুনেই মন ঠিক করে ফেললাম। লাল চৌদার আমার পরম বিশ্বাসী চাকর– সে যদি আমাকে নিরপরাধ মনে না-করে, আদালতের জুরিরাই-বা করতে যাবে কেন? সেই রাতেই আমি আর লাল চৌদার হাওয়া করে দিলাম লাশ। পরের কয়েকদিনের মধ্যেই লন্ডনের কাগজে গরম গরম খবর ছাপা হতে লাগল ক্যাস্টেন মর্সটানের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে! যা বললাম তা শুনে বুঝেছ নিশ্চয় এর জন্যে আমাকে দায়ী করা চলে না। দোষ আমার একটাই– শুধু লাশ পাচার নয়, দৌলতসুদ্ধ লুকিয়ে ফেললাম। শুধু নিজের অংশ নয়, মর্সটানের বখরাও আত্মসাৎ করলাম। এখন চাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক! কাল নিয়ে এসো আমার কাছে। রত্নপেটিকা লুকিয়ে রেখেছি–

ঠিক এই সময়ে একটা ভয়াবহ পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর চোখে-মুখে। দু-চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে, ঝুলে পড়ল চোয়াল, চেঁচিয়ে উঠলেন কানের পর্দা ফাটানো বিষম বিকট গলায়, বার করে দাও... বার করে দাও ওকে ! হে ভগবান! হে ভগবান! জীবনে সেই চিৎকার, সেই গলা, আমি ভুলতে পারব না। উনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন আমাদের পেছন দিককার জানলায়। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম সেই দিকে। দেখলাম, অন্ধকারের ভেতর থেকে কেবল একটা মুখ চেয়ে আছে আমাদের দিকে। কাচের ওপর নাক চেপে ধরায় সাদা হয়ে যাওয়া নাকের ডগা পর্যন্ত দেখতে পেলাম স্পষ্ট। দাড়িওলা লোমশ একটা মুখ; বুনো পশুর মতো দুই চোখে নারকীয় নিষ্ঠুরতা, মুখ-ভাবে গাঢ় জিঘাংসা। ভায়া আর আমি দু-জনেই দৌড়ে গেলাম জানালার সামনে– ততক্ষণে কিন্তু উধাও হয়েছে লোকটা। বাবার কাছে ফিরে

এসে দেখলাম মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, নাড়ি আর চলছে না, থেমে গেছে হৃদঘাত।

সেই রাতেই তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম বাগান, কিন্তু আততায়ীর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। জানালাটার নীচে কেবল দেখতে পেলাম ফুলগাছের মাটিতে একটি মাত্র পায়ের ছাপ। ওই পায়ের ছাপ না-দেখতে পেলে কিন্তু ধরে নিতাম জানালার কাচে যা দেখছি তা চোখের ভুল। গল্প শুনে ভয় পেয়ে একটা বীভৎস বন্য মুখকে কল্পনা করে নিয়েছি। কিন্তু গুপ্তচর যে অষ্টপ্রহর তৎপর আমাদের আশেপাশে– সে-রকম অনেক প্রমাণ পেলাম দু-দিনেই। একদিন ভোরবেলা উঠে দেখলাম বাবার ঘরে জানলা দু-হাট করে খোলা, আলমারি আর বাক্স-প্যাটরা হাটকে লাটঘাট করা এবং সিন্দুকের ওপর একটা ছেড়া কাগজ সাঁটা; তাতে জড়ানো ধাঁচে লেখা– 'চারের সংকেত' । কথাটার মানে কী, নৈশ আগন্তুকই-বা কে– কিছুই জানা গেল না। বাবার কোনো জিনিসই কিন্তু খোয়া যায়নি– অথচ সব জিনিসই হটকানো হয়েছে। শেষ জীবনে বাবা একটা অদ্ভুত আতঙ্কে ভুগছিলেন। সেই আতঙ্কর সঙ্গে আশ্চর্য এই ব্যাপারের যোগসূত্র থাকা স্বাভাবিক– এ ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না আমাদের। আজও কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড রহস্য হয়ে রয়েছে দুই ভাইয়ের কাছে।'

হুকো নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নেওয়ার জন্যে স্তব্ধ হল পুঁচকে লোকটা। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তাবিষ্টভাবে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নাকমুখ দিয়ে। অত্যাশ্চর্য উপাখ্যান শুনেছি আমরা নিবিষ্ট চিত্তে। বাবার মৃত্যু-কাহিনি শুনে মড়ার মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলেন মিস মর্স্টান, ভয় হয়েছিল পাছে অজ্ঞান না হয়ে যান। পাশের টেবিলে একটা কাচের জল পাত্র ছিল। সুদৃশ্য পাত্র– ভেনিস থেকে আমদানি। এক গেলাস জল ঢেলে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলাম– জল খেয়ে অনেকটা সামলে নিলেন ভদ্রমহিলা। তন্ময় মুখে হেলান দিয়ে বসেছে শার্লক হোমস– চোখের পাতা নেমে এসেছে উজ্জ্বল চোখ জোড়ার ওপর। সে-মুখের দিকে

তাকিয়ে মনে পড়ল আজকেই দৈনন্দিন জীবনের একঘেঁয়েমি নিয়ে অভিযোগ করেছিল বন্ধুবর। এখন যে-সমস্যা হাতে এসেছে, তার জট ছাড়াতেই কাল ঘাম ছুটে যাবে– বুদ্ধিপ্রবৃত্তিকে চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে! পর্যায়ক্রমে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বীয় গল্পের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল থেডিয়াস শোল্টো। অতিরিক্ত লম্বা নলটা মুখে লাগিয়ে গুরুক গুরুক শব্দে ধোয়া ছাড়ার ফাঁকে শুরু করল বিচিত্র উপাখ্যানের পরবর্তী অংশ।

'বাবার মুখে গুপ্তধনের সংবাদ শুনে উত্তেজিত হয়েছিলাম দুই ভাই, আশা করি তা বুঝে নিয়েছেন। হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস খুঁড়ে খুঁড়ে ঝাঁঝরা করে ফেললাম বাগান, কিন্তু গুপ্তধনের চিহ্ন পেলাম না। হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল বাবা মরণকালে গোপন ঠিকানাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না বলে। মুক্তোর মুকুটটাই কেবল রত্নপেটিকার বাইরে রেখেছিলেন বাবা। ওই একখানা মুকুটের মূল্য বিচার করেই আঁচ করতে পারছিলাম নিখোঁজ পেটিকার ঐশ্বর্য। মুকুট নিয়ে দুই ভাই আলোচনা করেছিলেন। মুক্তোগুলো বাস্তবিকই অত্যন্ত মূল্যবান। এমন ঐশ্বর্য হাতছাড়া করার খুব একটা ইচ্ছে নেই দেখলাম ভাইয়ের। আপনারা বন্ধু মানুষ, আপনাদের বলতে বাঁধা নেই, বাবার অন্যায় খুব একটা বড়ো করে দেখেনি আমার ভাই। ওর মতে নাকি মুক্তোর মুকুট হাতছাড়া করলেই কানাকানি হবে তাই নিয়ে– তারপরে ঝামেলায় পড়ব দু-জনে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে রাজি করালাম যাতে মিস মসটানের ঠিকানা জোগাড় করে কিছুদিন অন্তর অন্তর একটি করে মুক্তো পাঠিয়ে দিতে পারি– ফলে অন্তত নিজেকে আর নিঃস্ব মনে করতে পারবেন না উনি।

মিস মর্সটান অন্তর দিয়ে বললেন, মন আপনার সত্যিই উদার। অশেষ কৃতজ্ঞ রইলাম।

হাত নেড়ে অভিনন্দনটা গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে বললে খুদে ব্যক্তি:

'আমরা হলাম গিয়ে আপনার অছি। আমার এই মতের সঙ্গে ভায়া বার্থোলোমিউ অবশ্য কিছুতেই একমত হতে পারেনি। অনেক টাকার মালিক আমরা। আর টাকার দরকার নেই আমার! তা ছাড়া একজন তরুণীকে এইরকম ন্যক্কারজনকভাবে পথে বসানোটাও অত্যন্ত কুরুচির ব্যাপার। এসব ব্যাপারে ফরাসি ভাষায় অনেক ভালো কথা আছে। মতান্তর এবং খিটিমিটি এমন চরমে পৌঁছোল যে ঠিক করলাম আলাদা থাকব। পণ্ডিচেরী লজ ছাড়লাম সেই কারণেই- সঙ্গে আনলাম বুড়ো খিদমতগার আর উইলিয়ামসকে। গতকাল একটি খবর কানে এল। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটেছে। গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তক্ষুনি যোগাযোগ করলাম মিস মর্স্টানের সঙ্গে। এখন চলুন সবাই মিলে গিয়ে যার যা শেয়ার বুঝেসুঝে নিই।

কাল রাত্রে আমার ইচ্ছে জানিয়ে রেখেছি ব্রাদার বার্থোলোমিউকে। কাজেই এখন গেলে আমাদের স্বাগতমই জানানো হবে– অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হবে না।

স্তব্ধ হল থোডিয়াস শোল্টো– কিন্তু ঝাঁকুনি কাপুনি থামল না। বিলাসবহুল কেদারায় আসীন ক্ষুদ্র বপুটি মুহুর্মুহু চিড়িক দিয়ে উঠতে লাগল আত্যন্তিক উত্তেজনায়। চুপচাপ বসে রইলাম আমরা তিনজনে– মুখে টু শব্দটি নেই- মন নিমজ্জিত নিতল রহস্য সমুদ্রে। ঘটনা যে এ-রকম মোড় নেবে ভাবা যায়নি। সবার আগে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল হোমস।

বলল, আপনি মশায় গোড়া থেকেই কাজের কাজ করে এসেছেন। যা করেছেন, ভালোই করেছেন। যা বোঝেননি, এখুনি তা বুঝিয়ে দিতে পারি। রহস্য পরিষ্কার করে দিতে পারি। কিন্তু এখন নয়– রাত অনেক হল। মিস মর্স্টান ঠিকই বলেছেন। হাতের কাজ আগে শেষ করা যাক।

উঠে পড়ল নব পরিচিত শোল্টো, যত্নের সঙ্গে গুটিয়ে রাখল হুঁকোর নল, তারপর পর্দার আড়াল থেকে বার করল একটা বেজায় লম্বা টপ-কোট– ফাঁস

আর বোতাম ছাড়াও সলোম ভেড়ার চামড়ার তৈরি কলার যার দেখবার মতো। গুমোট রাত, তা সত্ত্বেও কোটের বোতাম লাগাল গলা পর্যন্ত, সবশেষে মাথায় ছিল খরগোশের চামড়া দিয়ে তৈরি কানঢাকা টুপি– ফলে শুধু শীর্ণ, চঞ্চল মুখখানিই বেরিয়ে রইল বাইরে– বাকি শরীরটা ঢাকা পড়ল ধড়াচূড়ার আড়ালে।

অলিন্দে বেরিয়ে বলল সাফাই হিসেবে, স্বাস্থ্য আমার কাচের মতোই ঠুনকো জানবেন। তাই বাধ্য হয়ে বারোমেসে রুগি সেজে থাকতে হয়।

গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে, যাওয়ার ব্যবস্থাও পূর্বপরিকল্পিত। কেননা ভেতরে উঠে বসতে-না-বসতেই চাবুক হাঁকিয়ে নক্ষত্রবেগে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলল চালক। চাকার ঘরঘরানির ওপর গলা তুলে একনাগাড়ে কথা বলে চলল থেডিয়াস শোল্টো।

বার্থোলোমিউ কিন্তু দারুণ সেয়ানা। গুপ্তধনের হদিশ কীভাবে বের করেছে জানেন? বাগানে তন্নতন্ন করে খোঁজার পর ও বুঝছিল রত্নপেটিকা বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে! তাই বাড়ির প্রতিটি বর্গইঞ্চির হিসেব নিয়েছে– যাতে কোনো অংশ চোখ এড়িয়ে না-যায়। মাপজোপ করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ওর টনক নড়ায়। বাড়িটা চুয়াত্তর ফুট উঁচু! কিন্তু প্রতিটা ঘরের উচ্চতা আলাদাভাবে যোগ করার পর এবং দুটো ঘরের মাঝের সঠিক ব্যবধান কত জেনে সেই যোগফলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল দাঁড়াচ্ছে মাত্র সত্তর ফুট। তার মানে চার ফুটের কোনো হিসেব নেই। হিসেবের বাইরে এই চার ফুট তাহলে বাড়ির মাথার দিকেই আছে। ওপরতলার সিলিং ফুটো করে দেখা গেল সত্যিই তারও ওপরে রয়েছে একটা ঘর– বালি সিমেন্ট দিয়ে পরিপাটিভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে চোখের আড়ালে। এহেন চিলেকোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো বরগার ওপর রয়েছে রত্নপেটিকা। ফুটোর মধ্যে দিয়ে পেটিকা নামিয়ে ঘরেই রেখে দিয়েছে বার্থোলোমিউ। মণিমুক্তোর হিসেবও করেছে। আন্দাজ দাম প্রায় পাঁচলক্ষ পাউন্ড।

যক্ষপতির রত্নপুরীসম এই বিপুল অংশটি শুনে বিস্ফারিত চোখে আমরা চাইলাম পরস্পরের মুখের দিকে। মিস মর্স্টানকে যদি তাঁর স্বত্ব পাইয়ে দিতে পারি, তাহলে রাতারাতি বরাত ফিরে যাবে তার। ছিলেন অভাবী গৃহশিক্ষয়িত্রী, হবেন ইংলন্ডের সেরা ধনবতী। সাচ্চা বন্ধুমাত্রই এ-খবরে উল্লসিত হবে, আমি কিন্তু হতে পারলাম না। বলতে মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু বলছি– নিদারুণ স্বার্থপরতায় নিমেষে মোচড় দিয়ে উঠল মনটা এবং সিসের মতো ভারী হয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। অভিনন্দন জানাতে গেলাম, কিন্তু জিভ জড়িয়ে গেল, তোতলামি সার হল। অবশেষে বসে রইলাম মাথা হেট করে। নবীন সুহৃদের বকবকানির একটা বর্ণও ঢুকল না কানে। লোকটা নিঃসন্দেহে বিষাদ রোগে ভুগছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে, অনর্গল অনেক রকম রোগের লক্ষণ বলে যাচ্ছিল সে এবং আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল অসংখ্য টোটকা ওষুধের খবরাখবর নিয়ে। হাতুড়ে চিকিৎসা যদিও, তাহলে ওষুধগুলো কী দিয়ে তৈরি এবং কীভাবে কাজ করে শরীরের ভেতরে– বিরামবিহীনভাবে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিল সেইসব তথ্য। কতকগুলো ওষুধ তো চামড়ায় মোড়া পকেট বইতে লিখেও রেখেছিল। আশা করি সে-রাতে আমি প্রশ্নের যেসব জবাব শুনিয়েছিলাম, তা তার মনে নেই। হোমস নাকি আমার দু-একটা জবাব শুনে ফেলেছিল। দু-ফোটার বেশি ক্যাস্টর অয়েল খেলে দারুণ বিপদ হতে পারে বলবার পরেই নাকি ঘুমের ওষুধ হিসেবে অধিকমাত্রায় স্ট্রিকনিন খেতে সুপারিশ করেছিলাম। যাই হোক, গন্তব্যস্থানে গাড়ি পৌঁছোতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। ঝাঁকুনি দিয়ে থামল শোল্টো এবং লাফ দিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে ধরল চালক।

হাত ধরে মিস মর্স্টানকে গাড়ির বাইরে এনে বললে থেডিয়াস শোল্টো, মিস মর্স্টান, এই হল গিয়ে আমাদের পণ্ডিচেরি লজ।

৫। পণ্ডিচেরি লজের বিয়োগান্তক কাহিনি

নৈশ অ্যাডভেঞ্চারে শেষ পর্বে পৌঁছোলাম রাত এগারোটা নাগাদ। বিরাট শহরের স্যাঁৎসেঁতে কুয়াশা ফেলে এসেছি পেছনে, আকাশ এখানে পরিষ্কার, রাত্রি অতি মনোহর। উষ্ণ পশ্চিমে হাওয়ার টানে ভারী মেঘগুলো মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে আকাশপথে, মাঝে মাঝে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আধখানা বাঁকা চাঁদ। কিছুদূর পর্যন্ত সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেলেও গাড়ির ভেতরে একটা সাইড-লণ্ঠন বের করে রাস্তায় বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করল থেডিয়াস শোল্টো।

মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে পণ্ডিচেরি লজ। ভাঙা কাচের টুকরো বসানো একটা বেজায় উঁচু পাথুরে দেওয়াল ঘিরে রয়েছে চারদিকে। ভেতরে ঢোকার দরজা একটাই; পাল্লার ওপর লোহার পাত বসানো। সংকীর্ণ এই দরজার কপাটেই অনেকটা ডাকপিয়োনদের কায়দায় খটখট খটাখট শব্দে অদ্ভুত রকমের টোকা দিয়ে চলল আমাদের পথপ্রদর্শক।

রূঢ়, চড়া গলায় কে যেন বললে ভেতর থেকে, 'কে?'

'আমি, ম্যাকমুর্ডো, আমি। আমার টোকার আওয়াজ অ্যাদিনে মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তোমার।

চাপা গজরানির আওয়াজ শোনা গেল এবার, সেইসঙ্গে চাবির ঝনৎকার। ক্যাচ ক্যাচ শব্দে খুলে গেল ভারী দরজা, খর্বকায় কিন্তু বিশাল-বক্ষ এক পুরুষ মাথার ওপর লণ্ঠন তুলে ধরে দাঁড়াল দরজায়– ঠেলে-বেরিয়ে-আসা মুখে চিকমিক করতে লাগল, অবিশ্বাস মাখানো দুই চক্ষু।

মি. থেডিয়াস দেখছি! সঙ্গে কারা? আর কাউকে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই মনিবের।

নেই কীহে? অবাক করলে দেখছি। কাল রাতেই ভায়াকে বলেছি জনাকয়েক বন্ধু আসবে আজ রাতে।

আজ সকাল থেকেই ঘরের বাইরে আসেননি মনিব। হুকুমও পাইনি। হুকুম ছাড়া আমি চলি না মি. থেডিয়াস। আপনি আসতে পারেন– কিন্তু বন্ধুদের ওইখানেই রেখে আসতে হবে।

বাধাটা অপ্রত্যাশিত। হতচকিত, অসহায় মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল থেডিয়াস শোল্টো।

খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু, ম্যাকমুর্ডো! আমার ওপরে তুমি কথা বলার কে? দেখতে পাচ্ছ না ভদ্রমহিলা রয়েছেন? উনি কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন এত রাত্রে?

অটল স্বরে বললে দ্বাররক্ষক, মাপ করবেন। আপনার বন্ধু হলেই যে আমার মনিবের বন্ধু হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। নুন খেয়ে বেইমানি করতে পারব না। আমার কাজ আমাকে করতে দিন। আপনার বন্ধুদের কাউকেই আমি চিনি না।

'আলবাত চেনো, ম্যাকমুর্ডো। সোল্লাসে বললে শার্লক হোমস। এত সহজে আমাকে ভুললে তো চলবে না। চার বছর আগে তোমার বাজি জেতার রাতে অ্যালিসনের ঘরে তোমার সঙ্গে যে-অ্যামেচারটি তিন রাউন্ড লড়ে গিয়েছিল, তাকে কি একেবারেই মনে পড়ছে না বলতে চাও।

আরে সর্বনাশ। মি. শার্লক হোমস যে! যেন ব্যাঘ্র গর্জন করল প্রাইজ-ফাইটার দ্বাররক্ষক। কী কাণ্ড? চিনতেই পারিনি আপনাকে! চুপটি করে ওইখানে দাঁড়িয়ে না-থেকে ভেতরে এসে চোয়ালের নীচে আপনার ক্রস হিটখানা ঝাড়লেই কিন্তু চিনে ফেলতাম সঙ্গেসঙ্গে। ক্ষমতা ছিল আপনার, নষ্ট করলেন। লাইনে এলে অনেক উঁচুতে উঠতেন।

শুনে রাখ, ওয়াটসন, শুনে রাখ। জীবনে আর যদি কিছু করতেও না-পারি, বিজ্ঞানসম্মত একটা পেশা অন্তত খোলা রইল আমার সামনে, হাসতে

হাসতে বললে হোমস। এবার নিশ্চয় আমাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে না, দো ম্যাকমুর্ডো।

জবাবে বলল ম্যাকমুর্ডো, ভেতরে আসুন স্যার, ভেতরে আসুন। সবান্ধবে ভেতরে আসুন। মি. থেডিয়াস, আমি দুঃখিত। কিন্তু জানেন তো, হুকুম বড়ো কড়া। নিশ্চিন্ত না-হলে আপনার বন্ধুদেরও বাড়ির মধ্যে ঢোকানো নিষেধ।

ভেতরে কাঁকর বিছানো রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে শেষ হয়েছে একতাল কদাকার জড়পিণ্ডের মতো প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক– বাড়ি আর ফটকের মধ্যে অতখানি জমি মরুভূমির মতো নির্জন নিস্তব্ধ। চৌকোনা বাড়িখানাও কেমন জানি কাঠখোট্টা। চাঁদের আলো পড়েছে এক কোণে– ঝকমক করছে চিলেকোঠার জানালা– বাদবাকি অংশ ছায়ায় ঢাকা। মৃত্যুপুরীর মতো নিস্তব্ধতা, অট্টালিকার প্রকাণ্ড আকার আর থমথমে পরিবেশের জন্য বুক কেঁপে উঠল আমার। থেডিয়াস শোল্টো পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছে লক্ষ করলাম– খটখট শব্দে লণ্ঠন কাঁপতে লাগল হাতে– চঞ্চল হল আলোর ধারা।

বলল, ব্যাপার বুঝছি না। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে। বার্থোলোমিউকে পই পই করে বলেছিলাম আমরা আসব, তা সত্ত্বেও তো কই ওর জানালায় আলো জ্বলছে না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

হোমস জিজ্ঞেস করল, ওঁর বাড়ি পাহারার ধরন কি এইরকম?

ধরেছেন ঠিক। হুবহু বাবার মতো। বাবার চোখের মণি ছিল কিনা। আমার চাইতে বেশি ভালোবাসতেন ওকে। তাই তো আমার মনে হয় আমাকে যা বলেছেন তার চাইতে অনেক বেশি কথা বলে গেছেন বার্থোলোমিউকে। চাঁদের আলো যেদিকে পড়েছে, ওর জানালা কিন্তু ওইদিকেই! ঝকঝকে করছে দেখেছেন? কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে না।

না জ্বলছে না, বললে হোমস। তবে দরজার পাশে ছোটো জানলায় আলোর আভা দেখতে পাচ্ছি।

ওটা হাউসকিপারের ঘর! মিসেস বার্নস্টোন বুড়ির আস্তানা। ওর মুখেই সব খবর পাব। আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি একাই যাই। না-জানিয়ে হঠাৎ সবাই সামনে গেলে আঁতকে উঠতে পারে। কিন্তু ওকী চুপ! চুপ!

লণ্ঠন তুলে দাঁড়িয়ে গেল শোল্টো। কম্পিত হাতে কাঁপতে লাগল লণ্ঠনের বৃত্তাকার আলো। সেই আলোয় দেখতে লাগলাম আমার কবজি চেপে ধরলেন মিস মর্সটান। যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। কাঠের মতো দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম শব্দটা। সে-শব্দ আসছে মিশমিশে কালো মহাকায় বাড়ির দিক থেকে। রাতের নৈঃশব্দ খানখান করে আতীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে চলেছে একটা ভয়ার্ত নারীকণ্ঠ– বুকের রক্ত জল হয়ে যায় সেই বিকট চিৎকার শুনলে।

মিসেস বার্নস্টোনের গলা, অবশেষে বলল শোল্টো, বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে আর কেউ নেই। আপনারা দাঁড়ান। এখুনি আসছি।

দৌড়ে গেল শোল্টো, অদ্ভুত কায়দায় টোকা দিল দরজায়। দূর থেকেই দেখলাম পাল্লা খুলে দাঁড়াল একজন বৃদ্ধা– মাথায় বেশ লম্বা। শোল্টোকে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে বললে: এসে গেছেন? আঃ বাঁচলাম আমি। কী আনন্দই-না হচ্ছে আপনাকে দেখে মি. থেডিয়াস, স্যার!

আনন্দোচ্ছাস শেষ পর্যন্ত শুনতে পেলাম না। শোল্টোকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বুড়ি; চাপা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল বাইরে।

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে গিয়েছিল আমাদের গাইড। হোমস তুলে নিল লণ্ঠন, দুলিয়ে দুলিয়ে দেখতে লাগল চারিদিক। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল জমির ওপর স্তুপীকৃত রাশি রাশি রাবিশ, তারপর বাড়ির দিকে। মিস মর্সটানের হাত মুঠোয় নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। ভালোবাসা একটা অনির্বচনীয় জিনিস। আগে কেউ কাউকে দেখিনি। আলাপ সেই দিনই।

দু-জনের কথায় বা ভাবে ভালোবাসার চিহ্ন পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। তা সত্ত্বেও বিপদের মুহূর্তে আপনা থেকেই দু-জনে চাইছি দু-জনকে। এই নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি, অনেক আশ্চর্য হয়েছি। সেই মুহূর্তে কিন্তু ওঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছিল আমার ভেতরে। মিস মর্স্টানও বহুবার শুনিয়েছেন একই কথা– একই আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল তারও অন্তরে। বিপদ থেকে যেন আমি তাকে আগলে রাখি, নিরাপদ রাখি। হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ছোটো ছেলে-মেয়ের মতো– চারপাশের তমালকালো বিকট অপচ্ছায়ার মধ্যেও অনাবিল শান্তি বিরাজ করতে লাগল হৃদয়ের কন্দরে।

চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে মর্স্টান, অদ্ভুত জায়গা বটে!

ইংলন্ডের যত ছুঁচো যেন এখানেই জড়ো হয়েছে মনে হচ্ছে। ব্যালারাট একটা পাহাড়ের গায়ে এইরকম দৃশ্য দেখেছিলাম– সোনা সন্ধানীরা মাটি খুঁড়ে তাগাড় করে ফেলে রেখেছিল এইভাবে।

এখানেও তাই হয়েছে, বললে হোমস। এখানেও গুপ্তধন খোঁজা হয়েছে। মাটি খোড়া হয়েছে দীর্ঘ ছ-বছর পরে। তাই এই গর্ত জমিতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দড়াম করে দু-হাট হয়ে গেল বাড়ির দরজা এবং দু-হাত সামনে বাড়িয়ে আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে ধেয়ে এল থেডিয়াস শোল্টো। সে কী চিৎকার– বার্থোলোমিউ বিপদে পড়েছে! বার্থোলোমিউয়ের কিছু একটা হয়েছে? আমার ভীষণ ভয় করছে! এত সইবার ক্ষমতা আমার নার্ভের নেই।

সত্যি সত্যিই প্রায় সশব্দে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে শোল্টো। নিদারুণ ভয় পেয়েছে, ভেড়ার চামড়ার বিরাট কলারের ভেতর থেকে ভয়ার্ত শিশুর মতো অসহায় মিনতি মাখানো মুখখানা থরথর করে কাঁপছে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ভয়ানক ভয়ে।

কাট ছাঁট দৃঢ় কণ্ঠে হোমস শুধু বললে, বাড়ির ভেতরে চলুন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলুন!, ফুঁপিয়ে উঠল শোল্টো। যা করবার আপনি করুন– বুঝতে পারছি না এখন কী করা দরকার।

অলিন্দ পথের বাঁ-দিকে হাউসকিপারের ঘর। সবাই গেলাম সেখানে। ছটফট করছে বুড়ি, হনহন করে পায়চারি করছে ঘরময়, আঙুল মটকাচ্ছে মটমট করে। দুই চোখের ভয় ব্যাকুল দৃষ্টি কিন্তু সহজ হয়ে এল মিস মসটানকে দেখে– হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

মৃগী রুগির মতো বললে ফোঁপাতে ফোঁপাতে, কী মিষ্টি শান্ত মুখ গো তোমার। বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক! বাঁচলাম তোমায় দেখে! যা উৎকণ্ঠা গিয়েছে সারাদিন!

মিসেস বার্নস্টোনের শিরা-বার-করা মেহনত-ক্লিষ্ট বাহুতে মৃদু চাপড় দিয়ে কানে কানে দু-চারটে মধুর মেয়েলি সান্ত্বনার বাণী শোনাল হোমস। অদ্ভুত কাজ হল তাতে। রক্ত ফিরে এল বুড়ির নীরক্‌ত গালে।

বললে, সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রয়েছে কর্তা–কত ডাকছি, সাড়া দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে একলা থাকতে চায় জানি– তাই সকাল থেকে ডাকাডাকি করিনি। কিন্তু ঘণ্টা খানেক আগে উঁকি দিয়েছিলাম চাবির গর্ত দিয়ে। যা ভয় করেছিলাম, দেখি তাই হয়েছে; আপনি যান মি. থেডিয়াস– নিজে যান, গিয়ে দেখুন কী হয়েছে। দশ দশটা বছর মি. বার্থোলোমিউ শোল্টোকে দেখছি আমি– অনেক হাসি কান্নার চেহারা তার দেখেছি– কিন্তু এ-রকম মুখ কখনো দেখিনি।

থেডিয়াস শোল্টোর দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি আরম্ভ হয়ে গেছে দেখে লম্ফ তুলে নিয়ে গেল শার্লক হোমস। দারুণ ভয় পেয়েছে লোকটা– আমি তার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়ে না-নিয়ে গেলে পাটলে পড়ে যেত নির্ঘাত। হাঁটু পর্যন্ত কাঁপছিল ঠকঠক করে। সিড়ির ওপর নারকেল ছোবড়ার কাপেট পাতা। দু-বার হেট হয়ে পকেট থেকে লেন্স বার করে যা দেখল হোমস, আমার চোখে তা

কার্পেটের গায়ে নিছক ধুলোর দাগ ছাড়া আর কিছু মনে হল না। মাথার ওপর লম্ফ তুলে সুচীতীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে বায়ে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে একটার পর একটা ধাপ মাড়িয়ে সবার আগে রইল হোমস। মিস মসটান রয়েছেন সবার পেছনে– ভয়ে সিটিয়ে যাওয়া হাউসকিপারকে সঙ্গ দিতে।

তৃতীয় সিঁড়ির শেষে একটা টানা লম্বা গলিপথ, ডান দিকে দেওয়াল ঢাকবার বিরাট ভারতীয় পর্দা– পর্দায় আঁকা একটা প্রকাণ্ড ছবি। বাঁ-দিকে পরপর তিনটে দরজা। একইভাবে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল হোমস– আমরা রইলাম ঠিক পেছনে– লম্বা কালো ছায়া লুটিয়ে রইল পেছনে দীর্ঘ করিডরে। থামলাম তৃতীয় দরজার সামনে। টোকা মারল হোমস, সাড়া না-পেয়ে ঘোরাল হাতল ধরে। সবশেষে ঠেলা মারল গায়ের জোরে। কিন্তু খোলা গেল না পাল্লা। ফাঁকে লম্ফ রেখে দেখলাম শুধু যে ভেতর থেকে তালাই দেওয়া তা নয়, মোটাসোটা বেজায় মজবুত একটা খিল তোলা রয়েছে। চাবি দেওয়ার ফলে ফোকরটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। হেঁট হয়ে ফুটোয় চোখ দি েযছেঁড়া ধনুকের মতো সটান দাঁড়িয়ে উঠল শালক হোমস– নিশ্বাস নিল সশব্দে।

ওয়াটসন, এ যে দেখছি– শয়তানের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে, এভাবে বিচলিত হতে ওকে আমি কখনো দেখিনি। দেখে বল কী মনে হয়।

কোমর বেঁকিয়ে হেঁট হয়ে ফোকরে চোখ লাগালাম এবং নিঃসীম আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। ঝরনার ধারার মতোই যেন চাঁদের আলো ঢুকছে ঘরের মধ্যে। একটা চঞ্চল অস্পষ্ট দ্যুতিতে সারাঘর সমুজ্জ্বল। সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটি মুণ্ডু। শুধু একটি মুণ্ডু যেন শূন্যে ভাসছে, কেননা নীচের অংশ আবৃত অন্ধকারে। মুখটি আমাদের নতুন বন্ধু থেডিয়াসের। একইরকম রক্তহীন মুখবর্ণ মাথা ঘিরে লালচে ঝাউয়ের মতো খাড়া খাড়া চুল, কেশহীন শীর্ষদেশ পর্বতচূড়ার আকারে সমুন্নত। একটা বিকট হাসি যেন কায়েমি হয়ে সেঁটে বসেছে আড়ষ্ট মুখের ওপর, হাসি তো নয়, যেন একটা স্থির, অস্বাভাবিক দাঁতখিচুনি। চাঁদের

আলোয় মায়াময় ঘরের পরিবেশে সেই হাসি যেকোনো অপার্থিব ভ্রকুটির চাইতেও ভয়াবহ– স্নায়ু কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। থেডিয়াসের মুখের সঙ্গে এ-মুখের সাদৃশ্য এত বেশি যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলাম সত্যিই সে আমাদের সঙ্গে আছে কিনা। তার পরেই মনে পড়ল থেডিয়াস বলেছিল বার্থোলেমিউ আর সে আসলে যমজ ভাই!

হোমসকে বললাম, কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! কী করা যায় এখন বল তো?

দরজা ভাঙতে হবে, বলেই লাফ গিয়ে পড়ল দরজার গায়ে, দেহের পুরো ওজন দিয়ে ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে চলল যাতে তালা ভেঙে যায়।

কিন্তু ভেঙে গেল না। মচমচ শব্দ হল বটে, দরজা অটুট রইল। শেষকালে আমিও ঠেলা মারতে লাগলাম ওর সঙ্গে। দু-জনের মিলিত ধাক্কায় কাজ হল, আচমকা মচাৎ শব্দের সঙ্গে ভেঙে ঠিকরে গেল তালা আর খিল– হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম বার্থোলোমিউয়ের চেম্বারে।

ঘর তো নয়, যেন একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি– সেইভাবেই সাজানো। দরজার ঠিক উলটোদিকের দেওয়ালের তাকে কাচের ছিপি দেওয়া দু-সারি বোতল, মাঝে টেবিলে ছড়ানো বুনসেন বার্নার, টেস্টটিউব আর বকযন্ত্র। এককোণে বেতের ঝুড়িতে অ্যাসিডের পেটমোটা কার্বয়। একটা কার্বয় ভেঙে গেছে নিশ্চয়। অ্যাসিড পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে। কালচে রঙের তরল পদার্থ গড়াচ্ছে মেঝেয়। বাতাসে উৎকট আলকাতরার ভারী গন্ধ। ভাঙা কাঠের বাতা আর চুনবালি রাবিশের ওপর দাঁড় করানো একটা কাঠের মই– মইয়ের মাথায় সিলিংয়ে একটা ফুটো– মানুষ গলে যাওয়ার মতো। মইয়ের গোড়ায় তাগাড় করা বেশ খানিকটা দড়ি।

টেবিলের পাশে কাঠের চেয়ারে বসে বাড়ির মালিক। বিধ্বস্ত অবস্থা! মাথা ঝুলে রয়েছে বাঁ-কাধের ওপর। বীভৎস দুর্বোধ্য হাসি। প্রকট ঠোঁট আর দাঁত।

দেহ ঠান্ডা, আড়ষ্ট– প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে। শুধু মুখের ভাবই নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সাংঘাতিকভাবে তেউড়ে বেঁকে ফ্যানট্যাসটিক চেহারা নিয়েছে। হাতের কাছে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র। বাদামি রঙের সরু একটা লাঠি– লাঠির মাথায় মোটা সুতো দিয়ে কষে বাঁধা একটা পাথর– অনেকটা হাতুড়ির মতো। পাশে খাতার পাতা থেকে ছেড়া একটা কাগজ– তাতে টানা হাতে জড়ানো অক্ষরে লেখা কয়েকটা শব্দ। দেখল হোমস, তারপর তুলে দিল আমার হাতে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভুরু তুলে বললে– 'দ্যাখো।'

আমি দেখলাম। লণ্ঠনের আলোয় সে-লেখা পড়লাম এবং শিউরে উঠলাম। লেখাটা এই: চারের সংকেত।

হে ভগবান! মানে কী এসবের? বললাম বিমূঢ় কণ্ঠে।

মানে একটা হত্যা, মৃত ব্যক্তির ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, আ? যা ভেবেছিলাম। এই দ্যাখো।

কানের ঠিক ওপরে চামড়ায় বেঁধা লম্বা, কালো কাঁটার মতো একটা বস্তুর দিকে আঙুল তুলে দেখায় ও।

কাটা বলে মনে হচ্ছে, বললাম আমি।

কাটাই তো। টেনে নিয়ে দেখ। তবে সাবধান, বিষ মাখানো আছে।

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে তুললাম কাটাটা। সহজেই বেরিয়ে এল চামড়া থেকে, দাগ বলতে সে-রকম কিছু রইল না– শুধু একটা লাল বিন্দু ছাড়া– চামড়া যেখানে ফুটো হয়েছিল, সেখানে।

বললাম– এ তো দেখছি বড়ো গোলমেলে হেঁয়ালি। পরিষ্কার তো হচ্ছেই না, উলটে আরও গুলিয়ে যাচ্ছে।

হোমস বললে, ঠিক তার উল্টোটাই ঘটছে আমার কাছে। প্রতি মুহূর্তে হেঁয়ালি আরও পরিষ্কার হচ্ছে। দু-একটা ব্যাপার এখনও হাতে আসেনি, এলেই সম্পূর্ণ হবে কেসটা।

চেম্বারে ঢোকবার পর ভুলেই গেছিলাম থেডিয়াস শোল্টোর কথা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাউ মাউ করে সমানে কাঁদছিল আর কাঁপছিল সে– হাতে হাত ঘষে ইনিয়ে-বিনিয়ে আলাপ করে যাচ্ছিল নিজের মনে। মূর্তিমান আতঙ্ক বলে যদি কিছু থাকে সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলাম তার মধ্যে। আচমকা কেঁদে উঠল তীক্ষ্ণ, বিকট কুঁদুলে কণ্ঠে:

গুপ্তধন নেই! গুপ্তধন নেই! লুঠ হয়ে গেছে গুপ্তধন। ছাদের ফুটো দিয়ে ধরাধরি করে বাক্সটা নামিয়েছিলাম দু-জনে। শেষবারের মতো আমিই ওকে দেখছি জ্যান্ত অবস্থায়। কাল রাতে যাওয়ার সময়ে এই ঘরেই দেখে গেছি ওকে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুনেছিলাম– তালা দিচ্ছিল দরজায়।

ক-টা বেজেছিল তখন?

দশটা! আজ আর সে নেই- পুলিশ আসবে, আমাকে সন্দেহ করবে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি আমাকেই সন্দেহ করবে! কিন্তু আপনারা কি তাই করবেন? খুনই যদি করতাম তাহলে আপনাদের কি ডেকে আনতাম? কী সর্বনাশ। আমি কি পাগল হয়ে যাব?

হাত ঘুরিয়ে, ছুড়ে, নাচিয়ে ক্ষিপ্ত নৃত্য শুরু করে দিলে থেডিয়াস।

কাঁধে হাত রাখল হোমস। বললে কোমল কণ্ঠে, ভয় কী মি. শোল্টো। মিছে ঘাবড়াচ্ছেন। যা বলি তাই করুন। গাড়ি নিয়ে সোজা থানায় যান। পুলিশকে সব খুলে বলুন। ফিরে এসে এখানেই পাবেন আমাদের।

আচ্ছন্ন অবস্থায় হুকুম প্রতিপালন করল খুদে ব্যক্তি। হোঁচট খেতে খেতে নেমে গেল অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে।

৬। হাতেনাতে দেখাল শার্লক হোমস

দু-হাত ঘষে শার্লক হোমস বললে, হাতে আধঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে ওয়াটসন। সদব্যবহার করা যাক! কেসটা আমি মেরে এনেছি। তবে আত্মবিশ্বাস জিনিসটা বেশি থাকা ভালো নয়– ভুল হতে পারে। ওপর-ওপর জলের মতো সোজা কেস মনে হলেও কে জানে তলায় দারুণ ঘোর প্যাচ আছে কিনা।

'জলের মতো সোজা বলছ?' আমি তো হতভম্ব।

'সোজাই তো।' এমনভাবে বলল হোমস যেন ডাক্তারি ক্লাসে কঠিন রোগের নিদান শোনাচ্ছে ছাত্রদের। এককোণে বসে থাক, তোমার পায়ের ছাপ দিয়ে জট পাকিয়ে দিয়ো না কেসটাকে। এবার নামা যাক কাজে। পয়লা হেঁয়ালি হল এই: আততায়ীরা এসেছে কোন পথে, গেছেই-বা কোনদিক দিয়ে? কাল রাত থেকে দরজা খোলা হয়নি। কিন্তু জানলাটা? জানলার ধারে লম্ফ নিয়ে গিয়ে গোবরাটটা দেখতে দেখতে নিজের মনে উচ্চকণ্ঠে যা বলে গেল হোমস তা এই– "জানলার ছিটকিনি ভেতর দিকে। ফ্রেম শক্ত। পাশে কবজা নেই। খুলে দেখা যাক। নাগালের মধ্যে জলের পাইপ নেই। ছাদও নাগালের বাইরে। তা সত্ত্বেও একটা লোক জানলা দিয়ে ঢুকেছিল ঘরে। সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল কাল রাতে। গোবরাটের কাদায় এই তো একটা পায়ের ছাপ। একটা গোলমতো কাদার দাগও দেখেছ এখানে। মেঝেতেও রয়েছে দাগটা, রয়েছে টেবিলের পাশেও। ওয়াটসন, নিজে দ্যাখো, নিজে দ্যাখো। হাতেকলমে শিখতে যদি চাও তো নিজের চোখে দেখে যাও!

কাদার চাকতির মতো গোলাকার দাগগুলোর দিকে চাইলাম!

বললাম, এ তো পায়ের ছাপ নয়।

আমাদের কাছে এ-জিনিসের মূল্য তার চাইতেও অনেক বেশি। এ হল কাঠের খোটার ছাপ। গোবরাটটা দেখ– একটা ভারী বুটের ছাপ দেখতে পাবে–

চওড়া ধাতুর গোড়ালি লাগানো বুটজুতো। ঠিক তার পাশেই দেখতে পাবে কাঠের খোঁটার দাগ!

কাঠের পা-ওলা লোক।

ঠিক ধরেছ, সঙ্গে যে ছিল সে কিন্তু শক্তসমর্থ চটপটে। ডাক্তার, পারবে ওই দেওয়াল বেয়ে উঠতে?

খোলা জানলা দিয়ে তাকালাম বাইরে। চাঁদের আলোয় এখনও ঝকঝক করছে বাড়ির কোনা। জমি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আমি– ইটের দেওয়াল এত মসৃণ যে পায়ের আঙুল রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!, বললাম আমি।

'স্যাঙাত না-থাকলে অসম্ভব বই কী! কিন্তু যদি তোমার একজন দোস্ত থাকে ওপরে– এই ঘরে? ওই যে দড়িটা তাগাড় করা রয়েছে সিঁড়ির গোড়ায়, ওই দড়ির একটা দিক দেওয়ালের এই বিরাট হুকটার সঙ্গে বেঁধে যদি অন্য দিকটা ঝুলিয়ে দেয় নীচে? তাহলে কিন্তু তোমার একটা ঠ্যাং যদি কাঠেরও হয়, আর যদি দিব্বি তাগড়াই মজবুত স্বাস্থ্য তোমার থাকে, দড়ি বেয়ে উঠে আসা এমন কিছু কঠিন হবে না তোমার পক্ষে। কাজ শেষ করে অবশ্য বেরিয়ে যাবে যে-পথে এসেছ সেই পথেই। তোমার স্যাঙাতও দড়ি টেনে তুলে হুক থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দেবে মইয়ের গোড়ায়, জানলা টেনে বন্ধ করে ভেতর থেকে দেবে ছিটকিনি এবং যে-পথে এসেছিল ঘরে সেই পথেই যাবে বেরিয়ে। দড়িটায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল হোমস- ছোট্ট হলেও আর একটা পয়েন্ট কিন্তু খেয়াল রেখ। কাঠের ঠ্যাংঅলা বন্ধুটি দড়ি বেয়ে দিব্বি উঠে এলে কী হবে, পেশায় সে খালাসি নয়। হাত তেমন কড়া পড়া নয়। লেন্সের মধ্যে দিয়ে দড়ির শেষের দিকে– যা থেকে বোঝা যায় যে বেচারি হাত ফসকে সরসর করে নেমে গিয়েছিল নীচে– তাতেই ছালচামড়া উঠে গিয়েছিল তালু থেকে।

সব তো বুঝলাম, কিন্তু ধাঁধা তো আরও জটিল হয়ে গেল। রহস্যজনক এই স্যাঙাতটি ঘরের মধ্যে এল কী করে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যাঙাত! অনেক রহস্যই ঘিরে আছে তাকে–আছে অনেক ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। চিন্তামগ্নভাবে আমার কথাগুলিই যেন আউড়ে গেল হোমস। কেসটা একেবারেই মামুলি হয়ে যেত সে না-থাকলে। আমার কী মনে হয় জান, এক ঠেঙে আততায়ীর স্যাঙাতটি এদেশে অপরাধের একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করে গেল। এদেশে নতুন হলেও, ভারতবর্ষে এ-জাতীয় অপরাধ আকছার ঘটছে। যদ্দূর মনে পড়ে, সেনেগামবিয়ায় ঠিক এ-জাতীয় একটা ঘটনা ঘটেছিল।

আমি একগুঁয়ে স্বরে ফের বললাম, কী করে সে ভেতরে এল আগে বলো। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে, দেওয়াল বেয়ে জানলায় ওঠা অসম্ভব, তবে কি চিমনির মধ্য দিয়ে?

সম্ভব নয়। ঝাঁঝরি অত্যন্ত সরু তোমার আগেই তা ভাবা হয়ে গেছে।

তাহলে? আমি ছাড়বার পাত্র নই।

মাথা নাড়তে নাড়তে হোমস বললে, তবুও আমার নীতিসূত্র প্রয়োগ করতে চাও না। কতবার আর বলব তোমাকে যে অসম্ভবটা খারিজ করার পর যা পড়ে থাকবে– যত উদ্ভটই তা হোক না সার সত্য সেইটাই? আমরা জেনেছি জানলা দিয়ে সে আসেনি। দরজা দিয়েও আসেনি, চিমনি দিয়েও নামেনি। ঘরের মধ্যেও লুকিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়, কেননা ঘাপটি মারার মতো তেমন জায়গাও নেই। তাহলে সে এল কোত্থেকে?

ছাদের ফুটো দিয়ে। বললাম সবিস্ময়ে।

ছাদের ফুটো দিয়ে। ওই পথেই তাকে নামতে হয়েছে নীচে- আর কোনো রাস্তা নেই ঘরে ঢোকবার। লম্ফটা ধরো– উঠে গিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসি ছাদের ঘরে– যে-ঘরে পাওয়া গেছে গুপ্তধনের বাক্স।

মই বেয়ে উঠে গেল হোমস। দু-হাতে দুটো বরগা ধরে ঝুলতে ঝুলতে শরীর তুলে নিলে চিলেকোঠায়। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে লম্ফটা নিল আমার হাত থেকে। মই বেয়ে আমিও উঠে গেলাম চিলেকোঠায় একই পন্থায়।

ছোটো কুঠরিটা আকারে সত্যিই খুব ছোটো– লম্বায় দশফুট, চওড়ায় ছ-ফুট। মেঝে বলতে সারি সারি বরগার তলায় কাঠের বাতা আর চুনবালির পলেস্তারা। ঘরের মধ্যে তাই হাঁটতে গেলে এক বরগা থেকে আরেক বরগায় পা দিয়ে হাঁটতে হয়। আসবাবপত্র একদম নেই। মেঝেভরতি বহু বছর সঞ্চিত পুরু ধুলো। ছাদটা চুড়োর মতো এক জায়গায় গিয়ে মিশেছে– নিঃসন্দেহে বাড়ির আসল ছাদের ভেতরের দিকে।

ঢালু দেওয়ালে হাত বুলিয়ে বলল শার্লক হোমস, এই দেখ ঠেলা দরজা– ছাদে যাওয়ার পথ। এই দেখ ঠেলা মারতেই ফাঁকা হয়ে গেল– ছাদ দেখা যাচ্ছে– আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেছে। পয়লা নম্বর আততায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই পথেই। এবার দেখা যাক তার ব্যক্তিসত্তার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।

লম্ফ নামিয়ে মেঝের কাছে আনল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে যেন চমকে উঠল– এ-রকম চকিত মুখচ্ছবি আজ রাতে আর একবার দেখেছি। দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার– বেশ বুঝলাম ঠান্ডা হয়ে আসছে গা-হাত-পা। মেঝে ভরতি কেবল পায়ের ছাপ– অগুনতি পদচিহ্ন– সুস্পষ্ট, ধ্যাবড়া মোটেই নয়। আঙুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পরিষ্কার– কিন্তু সে-ছাপ পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের নয়– সাইজে তার অর্ধেক।

বললাম ফিসফিস করে, “হোমস, এ যে দেখছি বাচ্চা ছেলের কাণ্ড । কী ভয়ংকর!

মুহুর্তের মধ্যে আত্মস্থ হল হোমস। বলল, বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম একটু। অস্বাভাবিক কিছুই নেই এখানে। স্মৃতি বিদ্রোহ না-করলে এ-ব্যাপারে

তোমাকে আগেই বলতে পারতাম। আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না– চলো নীচে যাই।

নীচের ঘরে আসবার পর জিজ্ঞেস করলাম, পায়ের চিহ্ন সম্বন্ধে তোমার তত্ত্বটা এবার বলো শুনি?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল হোমস, ভায়া ওয়াটসন, নিজে বিশ্লেষণ করো। আমার পদ্ধতি তুমি জান। প্রয়োগ করে দ্যাখো কী পাও। তাতে শিখতে পারবে।

আসল ঘটনা কিছু জানা যাবে বলে তো মনে হয় না। আমার মাথায় অন্তত কিছু আসছে না।

এখুনি এসে যাবে, ছাড়া ছাড়া সুরে বললে হোমস। দরকারি আর কিছু এখানে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবুও দেখা যাক।

পকেট থেকে ফিতে আর লেন্স বার করে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরময় চরকিপাক দিতে শুরু করল বন্ধুবর। লম্বা নাকটা রইল কাঠের তক্তাগুলোর কয়েক ইঞ্চি দূরে। পাখির চোখের মতো কোটরাগত পুঁতি-সদৃশ চোখ দুটো যেন জ্বলতে লাগল ভেতরের উত্তেজনায়। ফিতে দিয়ে কখনো মেপে, কখনো এক মাপের সঙ্গে আর এক মাপ মিলিয়ে নিয়ে। কখনো চুল চেরা চোখ লেন্সের মধ্যে দিয়ে ধুলোবালি কাঠ পেরেক পরীক্ষা করে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল ঘরের সর্বত্র। দ্রুতসঞ্চারী ব্লাডহাউন্ড যেমন নিঃশব্দে কিন্তু ক্ষিপ্রবেগে ছোটে গন্ধের পেছনে, শার্লক হোমসও তেমনি ঝড়ের মতো পরীক্ষা করছে। অদৃশ্য সূত্রকে দৃশ্যমান করতে চাইছে। মেঝের কাছে নাক নামিয়ে দেখেশুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম। এ-মানুষ যদি অপরাধী হত, আতীক্ষ্ণ এই বুদ্ধিবৃত্তি আর উদ্যম অপরাধী অন্বেষণে না-লাগিয়ে অপরাধ অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করত, তাহলে ওর মতো ভয়ংকর ক্রিমিন্যাল এদেশে আর দু-টি থাকত না। শিকারী কুকুরের মতোই শুকে শুকে ঘর দেখতে দেখতে নিজের মনেই বকর বকর করে চলেছিল হোমস। আচমকা গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল বিপুল আনন্দে।

কপাল ভালো আমাদের। খুব একটা অসুবিধে আর হবে না। নম্বর ওয়ানের কপাল খারাপ। ক্রিয়োসোট মাড়িয়ে ফেলেছে। কার্বয় চিড় খেয়েছে, ক্রিয়োসোট মেঝেতে পড়েছে, নম্বর ওয়ান বেচারা তাতে পা দিয়ে ফেলেছে। দেখে যাও ভায়া, নিজের চোখেই দেখে যাও ছোটো পায়ের পরিষ্কার ছাপখানা— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইখানে, উৎকট গন্ধওলা ও ক্রিয়োসোটের ঠিক পাশটিতে।

কিন্তু তাতে হল কী?

'কী আবার হবে, নম্বর ওয়ান মুঠোয় এসে গেল। পৃথিবীর আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এই গন্ধ শুকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এমন একটা কুকুরকে আমি চিনি। শিকারি কুত্তার দল যদি হেরিং মাছের গন্ধ শুকে গোটা একটা জেলা পেরিয়ে যায়, বিশেষভাবে শেখানো হাউন্ড উৎকৃষ্ট গন্ধ শুকে যাবে কদ্দূর? ত্রৈরাশিক অঙ্কের মতো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। উত্তরটা হবে... আরে সর্বনাশ! দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা দেখছি এসে গেছে।

গুরুভার পদশব্দ এবং উচ্চকণ্ঠের হট্টগোল শোনা গেল নীচের তলায়— দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল হল ঘরের দরজা।

হোমস বললে, ওরা আসার আগে একটা কাজ করো। বেচারার হাত আর পায়ে তোমার হাত রাখো। কী বুঝলে?

কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে মাসল।

ঠিক তাই। রাইগর মর্টিসেও হাত-পা এত শক্ত হয় না— এখন যা হয়েছে। মুখের বিকট খিঁচুনি, ঠোঁট আর দাঁতের কপট হাসির সঙ্গে হাত-পায়ের অদ্ভুত শক্ত অবস্থাটা মিলিয়ে দাখো এখন কিছু পাওয়া যায় কিনা। কী মনে হচ্ছে?

মৃত্যু হয়েছে এমন একটা অ্যালকালয়েড দরুন যা সংগ্রহ করা হয়েছে গাছপালা বা লতাপাতা থেকে; শক্তিশালী বিষেরা অনেকটা স্ট্রিকনিনের মতো রক্তে মিশতেই ধনুষ্টংকারের বিক্ষেপ দেখা দিয়েছে।

মুখের পেশি টান-টান অবস্থা দেখামাত্র কিন্তু ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। তাই ঘরে ঢুকে আগে খুঁজেছিলাম রক্তের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার অস্ত্রটা। তুমিও দেখেছ জিনিসটা। সামান্য একটা কাঁটা, আলগোছে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথার চামড়ায়। এবার লক্ষ করো যেখানে কাঁটাটা ফুটেছে সে-জায়গাটা ফেরানো রয়েছে সিলিংয়ের দিকে– চেয়ারে সিধে হয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই তা হয়েছে। এবার পরীক্ষা করো কাঁটাটা।

অনিচ্ছুকভাবে কাঁটাটা নিয়ে ধরলাম লম্ফর সামনে! লম্বা কালো এবং বেশ ছুঁচালো কাঁটা। মুখের কাছে আঠা-আঠা মতো কী যেন চকচক করছে– শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ভোতা দিকটা ছুরি দিয়ে চেছে গোল করে রাখা হয়েছে।

হোমস জিজ্ঞেস করল, ইংলন্ডের কাটা কি?

না, না, মোটেই না।

তাহলে দ্যাখো মালমশলা যা পাওয়া গেল তা থেকে একটা ন্যায্য সিদ্ধান্তে আসা যাবে। নিয়মিত কাহিনি অবশ্য এসে গেছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পশ্চাদপসরণই করা কর্তব্য।

গুরুভার পদশব্দ একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল কাছে। শব্দ বেড়ে গেল করিডরে আসার পর। তার পরেই, হোমসের মুখের কথা ফুরোনোর আগেই দুমদাম শব্দে ভারিক্কি চালে ঘরে ঢুকল রীতিমতো মোটাসোটা একটি লোক– পরনে ধূসর বর্ণের সুট। হোতকা চেহারা, অতিরিক্ত লাল রক্ত-ঠাসা মুখাবয়ব। চোখের নীচে ছোটো থলির মতো ডুমোড়মো মাংস ঝুলছে এবং এই ফুলোর মধ্যে থেকে ভারি অদ্ভুত এক জোড়া অতি খুদে কিন্তু চিকমিকে চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রয়েছে সামনে। পেছন পেছন এল ইউনিফর্মধারী একজন ইনস্পেক্টর এবং থেডিয়াস শোল্টো– মুখচোখ দেখে বোঝা গেল বুকের মধ্যে তখনও ঢেঁকির পাড় পড়ছে সমানে।

হোঁতকা লোকটা ঘরে ঢুকেই বললে ঘসঘসে ভোতা গলায়, বাঃ কারবার গরম দেখছি। চমৎকার! চমৎকার! কিন্তু এরা কারা? বাড়ি বোঝাই এত খরগোশের গর্ত কেন?

প্রশস্ত কণ্ঠে হোমস বললে, আমাকে তো আপনার চেনা উচিত, মি. অ্যাথেনি জোন্স।

আরে শার্লক হোমস যে! তাত্ত্বিক মি. শার্লক হোমস। বেশ মনে আছে আপনাকে। বিশপগেট জুয়েল কেসে কার্যকারণ আর সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার সারগর্ভ লেকচার কি ভোলবার? তদন্তের ঠিক পথ আপনিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন মানছি। তবে কী জানেন, স্রেফ কপালজোরেই তা পেরেছিলেন- খুব একটা যুক্তি পরামর্শ দেখাতে পারেননি।

দেখাবার সুযোগও অবশ্য ছিল না– খুবই সোজা যুক্তির কেস।

আরে রাখুন! পারেননি সেটা স্বীকার করতে লজ্জা কীসের? যাকগে, এখানকার কেস তো দেখছি বেশ ভালোই! কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড রে বাবা! ভেরি ব্যাড! ভেরি ব্যাড! তত্ত্বকথা শোনবার সুযোগ একদম নেই- ন্যাড়া ঘটনা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো ব্যাপার! কপাল ভালো অন্য কেস নিয়ে নরউডে হাজির ছিলাম! খবর যখন পৌছল, আমিও তখন ফাঁড়িতে। লোকটা কীসে মরল মনে হয়?

এ-কেসে তত্ত্বকথা শোনবার সুযোগ কোথা, শুষ্ক কণ্ঠে বললে হোমস।

তা ঠিক। তা ঠিক তবে মাঝে মাঝে তত্ত্ব আউড়ে আলটপকা কাজ হাসিল করে ফেলেন তো। কী সর্বনাশ! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল দেখছি। পাঁচ লাখ পাউন্ডের মণিমুক্তো উধাও! জানলা খোলা ছিল না বন্ধ ছিল?

বন্ধ ছিল। কিন্তু গোবরাটে পায়ের ছাপ আছে।

বটে, বটে। জানলা যদি বন্ধই থাকে, তাহলে সে পায়ের ছাপের সঙ্গে এ-কেসের কোনো সম্পর্ক নেই। কমনসেন্স মশায়, সাধারণ বুদ্ধি। লোকটা হয়তো

এমনিতেই মারা গেছে, তড়কা হয়েছিল নিশ্চয়। রত্নবাক্সটা অবশ্য উধাও হয়েছে। হা! মাথায় এসেছে একটা তত্ত্ব। এ-রকম বুদ্ধি মাঝে মাঝে এসে যায় মাথায়। সার্জেন্ট– বাইরে যান। মি. শোল্টো– আপনিও যান বাইরে– আপনার বন্ধুরা ভেতরেই থাকবেন। হোমস কী মনে হয় বলুন তো? শোল্টো নিজেই স্বীকার করেছে কাল রাতে এখানে ও ছিল ভাইয়ের সঙ্গে। তড়কায় মারা গেল ভাই, হিরের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল শোল্টো! কী? কী মনে হয়?

তারপর মড়াটা দিব্বি উঠে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে দরজায় তালাচাবি দিয়ে এসে ফের বসে পড়ল চেয়ারে। কেমন?

হুম! গলতি রয়েছে দেখছি। তাহলে আবার কমনসেন্স খাটানো যাক। ভাইয়ের সঙ্গে এই ঘরেই ছিল থেডিয়াস শোল্টো। একটা ঝগড়াও হয়েছিল। এই পর্যন্ত খবর কিন্তু আমরা জেনেছি। ভাইটি যে তারপর মারা গিয়েছে এবং হিরে মানিকের বাক্স উধাও হয়েছে– তা-ও আমরা জেনে বসে আছি। থেডিয়াস বিদেয় হওয়ার পর থেকে তার ভাইকে আর কেউ দেখেনি, বিছানাতেও শোয়নি ভাইটি। থেডিয়াস শোল্টো অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় রয়েছে– বেসামাল। চেহারাটাও আর– ইয়ে, মোটেই আহামরি নয়। বুঝছেন নিশ্চয় জালে ফেলছি থেডিয়াসকে– এবার গুটিয়ে আনব জালের মুখ।

হোমস বললে, অনেক ঘটনাই এখনও আপনার অজানা। এই যে কাঠের টুকরোটা দেখছেন- সামান্য একটা কাঁটা– এটা কিন্তু লোকটার কানের ওপরে মাথার চামড়ায় গাঁথা ছিল– এখনও দাগ দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস কাটাটায় বিষ মাখানো আছে। টেবিলে কাগজটা ছিল– দেখতেই পাচ্ছেন কী লেখা রয়েছে কাগজে। তার পাশেই বাঁধা হাতুড়ির মতো অদ্ভুত এই জিনিসটা। এখন বলুন আপনার তত্ত্বে ওইসব খাওয়াবেন কী করে।

বেশ ভালোভাবেই খাপ খেয়ে যায়, জাঁকালো গলায় বললে মোটা গোয়েন্দা। বাড়ি বোঝাই তো দেখছি কেবল ইন্ডিয়ান কিউরিয়সিটি- ভারতবর্ষ

থেকে আমদানি হরেকরকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস। থেডিয়াস শোল্টো কাঁটাটা জোগাড় করেছে এর মধ্যে থেকেই– আর যদি তাতে বিষ মাখানেই থাকে, তাহলে বুঝতে হবে মতলবটা ছিল খুন করার। কার্ডটা স্রেফ ধোকাবাজি– পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। সমস্যা একটাই– ঘর থেকে বেরোল কীভাবে শোল্টো? আ! পেয়েছি! ছাদে একটা ফুটো করা হয়েছে দেখছি!

গতরের তুলনায় রীতিমতো ক্ষিপ্রবেগে দৌড়ে গিয়ে তরতর করে মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল হোতকা গোয়েন্দা– গুটিসুটি মেরে ঢুকে পড়ল সংকীর্ণ চিলেকোঠায়। পর মুহূর্তে শুনলাম উল্লসিত কণ্ঠ– ঠেলা দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছি।

কাঁধ ঝাকিয়ে হোমস বললে, মাঝে মাঝে বুদ্ধি খেলে যার মাথায়, আবিষ্কার তো সে করবেই! তারপর একটা প্রবচন আউড়ে গেল ফরাসি ভাষায়।

মই বেয়ে নামতে নামতে বললে অ্যাথেলনি জোন্স, ‘দেখলেন তো, তত্ত্বের চেয়ে ঘটনা অনেক ভালো। এ-কেসে আমার ভাবনাই শেষপর্যন্ত ঠিক হবে। ছাদে যাওয়ার ঠেলা দরজা রয়েছে চিলেকোঠায়– একটু খোলাও রয়েছে দরজাটা।

আমি খুলেছি।

তাই নাকি! আপনি খুলেছেন! দরজাটা তাহলে আপনিও দেখেছেন! দমে গেল বেচারা অ্যাথেলনি জোন্স। মরুকগে, আবিষ্কার যেই করুক না কেন, খুনি পালিয়েছে কোন পথে, তা তো জানা গেল। ইনস্পেকটর!

ইয়েস, স্যার। সাড়া এল বাইরের করিডর থেকে। মি. শোল্টোকে পাঠিয়ে দাও ভেতরে। মি. শোল্টো, আমার কর্তব্য আপনাকে সাবধান করে দেওয়া– এখন থেকে যা বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি রানির নামে!

কী হল! বলিনি আপনাদের? দু-হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে একবার আমার আর একবার হোমসের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বললে বেচারা শোল্টো।

হোমস বললে, কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে খালাস করব।

আরে আরে করেন কী মি. তত্ত্ববাদী, আকাশের চাদ হাতে পাইয়ে দেওয়ার কথা দিচ্ছেন? ভুল করছেন, মি. তত্ত্ববাদী, ভুল করছেন, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ডিটেকটিভ। শেষকালে হালে পানি পাবেন না।

মি. জোন্স, আমি শুধু ওঁকে খালাসই করব না, কাল রাতে এ-ঘরে যে দু-জন লোক হাজির ছিল, তাদের একজনের নাম আর চেহারার বিবরণও আপনাকে উপহার দেব! আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার নাম জোনাথন স্মল। লেখাপড়া বেশি শেখেনি, ছোটোখাটো চেহারা, কিন্তু খুব চটপটে, ডান পা-টা নেই। পায়ের জায়গায় লাগানো আছে একটা কাঠের খোটা– ভেতর দিকটা ক্ষয়ে গেছে। বাঁ-পায়ের ভারী বুটের সামনের দিকটা চৌকোনা থ্যাবড়া। গোড়ালিতে লাগানো আছে একটা লোহার বেড়। বয়েসে মাঝামাঝি, রোদে ঝলসানো চেহারা, দাগি আসামি। এতেই আপনার কাজ হবে। নিন আর একটা ফাউ। লোকটার হাতের তালুতে বেশ কিছু চামড়া দেখবেন নেই। অন্য লোকটা–

আ! অন্য লোকটা? নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কণ্ঠে ঘৃণা বৃষ্টি করলেও জোন্সের সাগ্রহ হাবভাব দেখে বোঝা গেল ওষুধ ধরেছে।

একটু অদ্ভুত টাইপের!, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল শার্লক হোমস। অবশ্য আশা রাখছি শিগগিরই আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব দু-জনকে। ওয়াটসন, এসো কথা আছে।

সিঁড়ির মাথায় আমাকে নিয়ে এল হোমস। ব

লল, হঠাৎ এই ঘটনার ফলে যে জন্যে আসা তা কিন্তু শিকেয় উঠল।

বললাম, আমিও তাই ভাবছি! এ-অবস্থায় অভিশপ্ত এই বাড়িতে মিস মর্সটানের আর থাকা উচিত নয়।

মোটেই নয়। তুমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। উনি থাকেন লোয়ার ক্যামবারওয়েলে মিসেস সিসিল ফরেস্টারের সঙ্গে– খুব বেশি দূর নয় এখান থেকে। গাড়ি নিয়ে ফিরে এসো– অপেক্ষায় থাকব। নাকি ক্লান্ত বোধ করছ?

একদম না। ফ্যানট্যাসটিক এই কারবারের শেষপর্যন্ত না-জেনে জিরোতে পারব বলে মনে হয় না। অনেক ধকল গেছে এই জীবনে, কিন্তু আজ রাতে পর-পর যেসব অদ্ভুত চমকের মধ্যে দিয়ে গেলাম– তাতে আমার ধাত ছেড়ে গিয়েছে। এত দূর যখন এসেছি, তোমার সঙ্গে থেকে শেষ না-দেখে যাচ্ছি না।

অনেক কাজ দেবে তুমি আমার সঙ্গে থাকলে। দু-জনে মিলে আলাদা তদন্ত করে ফয়সালা করব কেসটার– হাঁদা জোন্স গড়ে মরুক ওর তাসের প্রাসাদ। মিস মর্স্টানকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পর আমার ইচ্ছে তুমি ল্যামবেথে যাও। সেখানে জলের ধারে পাবে তিন নম্বর পিনচিন লেন, ডান দিকের তৃতীয় বাড়ি। শেরম্যান বলে একজন লোক থাকে সেখানে। মরা পাখির পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করে খড়কুটো ঠেসে বিক্রি করে। জানলায় দেখবে একটা খরগোশকে ধরে আছে একটা বেজি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে টেনে তুলবে বুড়ো শেরম্যানকে। আমার নাম করে বলবে টোবিকে এখুনি চাই। গাড়িতে চাপিয়ে টোবিকে নিয়ে সোজা চলে আসবে এখানে।

টোবি মানে একটা কুকুর তো?

হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত দো-আঁশলা কুকুর। গন্ধ শুঁকে শিকার ধরবার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। লন্ডনের পুরো গোয়েন্দা বাহিনির বদলে শুধু টোবির সাহায্য পেলেই আমি বর্তে যাব।

আমি নিয়ে আসছি টোবিকে। এখন বাজে একটা। তেজি ঘোড়ার গাড়ি পেলে ফিরে আসব তিনটের আগেই।

আমি ততক্ষণ বার্নস্টোনের পেট থেকে কিছু খবর বার করা যায় কিনা দেখি। মি. থেডিয়াসের মুখে শুনেছি ভারতীয় চাকরটা থাকে পাশের চিলেকোঠায়–

তাকেই টাকো দিয়ে দেখা যাক যদি কিছু জানা যায়। বাকি সময়টা গ্রেট জোন্সের গোয়েন্দাগিরি দেখে আর চাষাড়ে বিদ্রুপ হজম করে কাটিয়ে দেব। এ-ব্যাপারে কিন্তু অনেক সারগর্ভ মন্তব্য করে গেছেন কবি গ্যেটে।

৭। পিপে উপাখ্যান

সঙ্গে একটা ছ্যাকড়াগাড়ি এনেছিল পুলিশ। সেই গাড়িতে মিস মর্সটানকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। মেয়েরা একদিক দিয়ে সত্যিই দেবী। নিজের চাইতে দুর্বল মেয়ের সামনে ভেঙে তো পড়েই না, উলটে প্রবোধ দিয়ে যায়। ভয়াতুরা হাউসকিপারের সামনে শান্ত সমুজ্জ্বল মুখে সব ঝক্কিই সয়ে গেছে মিস মর্সটান– প্রশান্ত আচরণ দেখে বোঝাই যায়নি ভেতরে তার কী চলছে, গাড়িতে উঠে কিন্তু ভেঙে পড়লেন। প্রথমে মূর্ছা গেলেন, তারপর সে কী কান্না! এত রাতে এত অ্যাডভেঞ্চার সইতে পারবেন কেন? পরে আমাকে বলেছিলেন, সে-রাতে আমি নাকি সারাপথ নির্লিপ্তভাবে বসেছিলাম– যেন দূরের মানুষ! বেচারা! ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি কী তুমুল তুফান উঠেছিল আমার ছোট্ট বুকের খাঁচায় এবং কী অপরিসীম সংযমবলে ভাবোচ্ছাসকে চেপে রেখে বসেছিলাম গাড়িতে। আমার প্রেম, আমার সমবেদনা কিন্তু স্পর্শ করেছিল বই কী তাকে– যে-মুহূর্তে বাগানের পথে হাতে হাত দিয়েছিলাম– উজাড় করে দিয়েছিলাম আমার বুকভরা ভালোবাসা। বহু বছরের গতানুগতিক অভিজ্ঞতায় যা সম্ভব হত না– এক রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব হয়েছিল। মিস মর্সটানের সুমিষ্ট, অকুতোভয় প্রকৃতিকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম। তা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে ভালোবাসার কথা বার করতে পারিনি শুধু দুটো চিন্তার জন্যে। অসহায় দুর্বল মুহূর্তে ভালোবাসার কথা চাপিয়ে দেওয়া অশোভন– দেহে মনে, যিনি ভেঙে পড়েছেন তাকে এসব কথা বলা যায় না। তার চাইতেও যাচ্ছেতাই যা, তা হল আমাদের দু-জনের অসম আর্থিক অবস্থা। উনি এই মুহূর্তে সাংঘাতিক ধনবতী। হোমসের গবেষণা যদি সফল হয়, তাহলে পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের স্বত্বভোগী হবেন উনি একা। এমতাবস্থায় দৈব আমাদের পাশাপাশি এনেছে বলে আমার মতো একজন আধা মাইনের রিটায়ার্ড ডাক্তারের কি উচিত সেই সুযোগ নেওয়া? যদি

একটা খারাপ ধারণা করে বসে আমার সম্পর্কে? যদি ভাবেন আমার আসল মতলব ভাগ্য ফেরানো এবং প্রকৃতি অত্যন্ত নীচ? পাছে এমন একটা কিছু ভেবে বসেন, তাই ঝুঁকি নিতে পারলাম না কোনোমতেই। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতোই আমাদের মাঝে খাড়া রইল মণিমুক্তো।

দুটো নাগাদ পৌঁছোলাম মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ি। চাকরবাকর সব শুয়ে পড়েছিল কিন্তু জেগে বসেছিলেন মিসেস ফরেস্টার। মিস মর্সটান সেই অদ্ভুত চিঠিটা পাওয়ার পর উনিও খুব উদবিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। দরজা খুললেন নিজেই। মধ্যবয়সি সম্ভ্রান্ত মহিলা। মিস মর্সটানের কোমর মায়ের মতো জড়িয়ে ধরলেন, মায়ের মতো স্নেহ কোমল কণ্ঠে সম্বোধন করলেন। দেখে মনটা ভরে উঠল আনন্দে। মিস মর্সটান এ-বাড়ির মাইনে-করা কেউ নয় যেন– পরম বন্ধু। সম্মান সেইরকমই। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর মিসেস ফরেস্টার ভেতরে এসে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শোনাতে অনুরোধ করলেন আন্তরিকভাবে। তখন বললাম কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়ে বেরিয়েছি আমি। কথা দিলাম, পরে আসব। যখন যা ঘটবে জানিয়ে যাব। চলে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে আবার দেখলাম মন-ভরানো সেই দৃশ্য। অশান্তিপূর্ণ ভয়ঙ্কর রাতে এমন একটা শান্তির নীড় দেখেও মনটা হালকা হয়। খাটি ইংলিশ গেরস্থালি– শান্তিতে টইটম্বুর। আধখোলা দরজার সামনে সিঁড়ির ধাপে আলিঙ্গনাবদ্ধ দু-টি সম্ভ্রান্ত মহিলা– রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরে ঠিকরে আসছে হলঘরের আলো, দেখা যাচ্ছে ব্যারোমিটার আর সিঁড়ির চকচকে রড।

কুচুটে কেসটা মহা গোলমাল শুরু করে দিল মাথার মধ্যে। যতই ভাবি ততই যেন আরও করাল, আরও কালো মনে হতে থাকে। গ্যাসের আলোয় আলোকিত নিস্তব্ধ পথের ওপর গড়গড়িয়ে ছুটছে গাড়ি। ভেতরে বসে অসাধারণ কেসটার গোড়া থেকে ফের চিন্তা করছি নতুন করে। মূল সমস্যাটার জট অবশ্য খুলে এসেছে: ক্যাপ্টেন মর্সটানের মৃত্যু, মুক্তো পাঠানো, বিজ্ঞাপন এবং চিঠি–

সবই এখন দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। কিন্তু এই থেকেই এসে পড়েছি আরও গভীর, আরও শোচনীয় রহস্যে। ভারতবর্ষের রত্নবাক্সে, মর্সটানের মালপত্রের মধ্যে পাওয়া একটাই অদ্ভুত নকশা, মেজর শোল্টোর মৃত্যুকালীন বিচিত্র দৃশ্য, রত্নবাক্সের পুনরুদ্ধারের ক্ষণপরে উদ্ধারকারীকে হত্যা। অপরাধসংলগ্ন অতি-অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরা, পায়ের ছাপ, আশ্চর্য অস্ত্র, কার্ডে লেখা কথাগুলো– যা ক্যাপ্টেন মর্সটানের নকশায় লেখা কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়– সত্যি বড়ো জব্বর গোলকধাঁধা। আমার রুমমেটটির চাইতে কম বুদ্ধিধর কারো পক্ষে এ-রহস্যের ক্ষীণতম সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টাও দুরাশা মাত্র।

ল্যামবেথের নিম্নমহলের একটা অতি নোংরা রাস্তা হল পিনচিন লেনই। দু-পাশে সারি সারি দোতলা বাড়ি। তিন নম্বর বাড়িটার দরজায় বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা মারার পর তবে সাড়া পাওয়া গেল। আলোর আভা ফুটল খড়খড়ির ফাঁকে। একটা মুখ বেরিয়ে এল ওপরের জানলায়। বলল, দূর হ মাতাল কোথাকার! আর বেশি গোলমাল করলে কুকুর লেলিয়ে দেব– তেতাল্লিশটা কুকুর তোকে ছিড়ে খাবে।

আমি বললাম, একটা ছেড়ে দাও– সেইজন্যেই আসা।

দূর হ! তবে রে! দাঁড়া আপদ তাড়ানোর মশলা আমার এই ব্যাগেই আছে। এক ফোটা মাথায় পড়লেই ঠেলা বুঝবি!

আরে গেল যা! আমি আপদ হতে যাব কেন? এসেছি একটা কুকুর নিতে।

আবার মুখের ওপর কথা! তিন পর্যন্ত গুনব। তারপরে তোর মাথায় গিয়ে পড়বে গরম মশলার একটা ফোটা!

মি. শার্লক হোমস- এই বলে শুরু করেছিলাম– কিন্তু শেষ করতে হল না। জাদুমন্ত্রের মতো কাজ দিল শুধু ওই নামখানা। মুহূর্তের মধ্যে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওপরের জানলা, এক মিনিট যেতে-না-যেতেই ধড়াম করে খুলে

গেল সদর দরজা এবং দরজা জুড়ে সবিনয় মুখে আবির্ভূত হল মি. শেরম্যান– দীর্ঘ, কৃশ, শুষ্ক বৃদ্ধ; ঘাড়টা মোটা দড়ির মতো, কাঁধ ঈষৎ নোয়ানো এবং চোখ নীলচে কাচের চশমায় ঢাকা।

আসুন, স্যার। ভেতরে আসুন– মি: শার্লক হোমসের বন্ধুর জন্যে এ-বাড়ির দরজা সব সময়ে অবারিত। হুশিয়ার! ব্যজারটার (বেজি আর ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ) কাছ দিয়েও যাবেন না, বড্ড কামড়ে দেয়। কী দুষ্টু! কী দুষ্টু! ভদ্রলোককে খামচাতে শখ হয়েছে বুঝি? এ-কথাটা বলা হল একটা স্টোট বেজিকে। খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে ক্রুর মাথা আর লাল চোখ বাড়িয়ে চেয়ে ছিল আমার দিকে। 'ঘাবড়াবেন না স্যার। ওর দাঁত নেই- ভেঙে দিয়েছি। ঘরময় ছোটে, গুবরে পোকা খতম করে। প্রথম দিকে ব্যবহারটা খারাপ করে ফেলেছি। গায়ে মাখবেন না। ছোড়াগুলো বড্ড জ্বালায়, যখন-তখন কত লোক যে এসে কড়া নাড়ে। এবার বলুন কী চান মি. শার্লক হোমস?

তোমার একটা কুকুর।

আ! টোবিকে নিশ্চয়?

হ্যা। নামটা টোবি-ই বটে।

বাঁ-দিকের সাত নম্বরে থাকে টোবি।

চারপাশের অদ্ভুত প্রাণীদের মাঝখান দিয়ে মন্থর চরণে মোমবাতি হাতে এগুলো বৃদ্ধ। ছায়াময়, অনিশ্চিত আলোয় কেবল চোখে পড়তে লাগল চকচকে ঝকঝকে স্ফুলিঙ্গর মতো বহু চক্ষু নানা কোণ থেকে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এমনকী মাথার ওপরকার মাচা থেকেও সারিবদ্ধ মোরগ নির্বাকমুখে ঘুমভাঙা মেজাজে একবার এ-পা আর একবার সে-পায়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইল আমাদের পানে।

টোবি কুকুরটা দেখলাম অতি কদাকার প্রাণী। ঝোলা কান, লম্বা চুল। গায়ের রং সাদায় আর বাদামিতে মিশোনো, হাটে দুলেদুলে হাসের মতো অতি

বিতিগিচ্ছিরিভাবে। জাত অর্ধেক স্প্যানিয়েল অর্ধেক লার্চার। বৃদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ এক ডেলা চিনি দিল আমার হাতে। একটু দ্বিধা করে ডেলাটা আমার হাত থেকে মুখে নিল টোবি- বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেই পেছন পেছন এল আমার। উঠে বসল গাড়িতে, নির্বিঘ্নে এল সঙ্গে। প্রাসাদ ঘড়িতে ঢং ঢং করে যখন তিনটে বাজছে, আমি ফিরে এলাম পণ্ডিচেরি লজে। শুনলাম প্রাক্তন বাজি জিতিয়ে লড়াকু ম্যাকমুর্ডোকেও গ্রেপ্তার করে মি. শোল্টোর সঙ্গে হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। ফটক পাহারায় ছিল দু-জন কনস্টেবল। ডিটেকটিভের নাম বলতেই ভেতরে যেতে দিল আমাকে কুকুরসমেত।

পকেটে হাত পুরে দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল হোমস।

আ! এই তো এসে গেছে আমার টোবি। গুড ডগ! তুমি যাওয়ার পর অনেক কেরদানি দেখাল আথেলনি জোন্স। শুধু থেডিয়াসকেই নয়, হাউসকিপার ইন্ডিয়ান চাকর, এমনকী ফটকের দারোয়ানকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে খুনির শাগরেদ বলে। বাড়ি এখন খালি– ওপর তলায় মোতায়েন আছে কেবল একজন সার্জেন্ট। কুকুর এখানে রেখে চলো ওপরে যাই।

হল ঘরের টেবিলের পায়ায় টোবিকে বেঁধে আমরা উঠে এলাম ওপরতলায়। ঘর যেমন তেমনি আছে। মাঝের চেয়ারে আসীন নিষ্প্রাণ মূর্তিটিকে কেবল একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া আছে। এককোণে বসে একজন পুলিশ সার্জেন্ট।

সার্জেন্ট, তোমার লণ্ঠনটা ধার দাও তো, বলল হোমস। এবার কর্ডটা বাঁধো আমার গলায় যাতে সামনে ঝোলে। ধন্যবাদ। জুতো মোজা খুললাম। ওয়াটসন, নীচে নিয়ে যাও। পাইপ বেয়ে ওঠানামা করতে হবে কিনা। রুমালটা ক্রিয়োসোটে ডুবিয়ে দাও। ওতেই হবে। এবার চিলেকোঠায় এসো আমার সঙ্গে।

ফুটো দিয়ে গেলাম ওপরে। ধুলোয় আঁকা পায়ের ছাপগুলোয় আবার লণ্ঠনের আলো ফেলল হোমস।

বলল, বিশেষভাবে লক্ষ করো ছাপগুলো। বৈশিষ্ট্য কিছু দেখছ?

এ-ছাপ হয় বাচ্চা ছেলের, নয় বেঁটে মেয়েছেলের।

সাইজ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে?

অন্যান্য পায়ের ছাপের মতোই মনে হচ্ছে।'

মোটেই না। এই দ্যাখো। ডান পায়ের এই ছাপটা দ্যাখো ধুলোর ওপর। আমার খালি পায়ের ছাপ পাশে ফেললাম। সবচেয়ে বড়ো তফাতটা কোথায় বলো তো?

তোমার পায়ের আঙুলগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে। অন্যান্য ছাপটায় বেশ ফাঁক ফাঁক।

ঠিক ধরেছ। এটাই আসল পয়েন্ট। মনে রেখো পয়েন্টটা। এবার একটা কাজ করো। ঠেলা জানলাটার সামনে যাও– কাঠের ফ্রেমটা শোঁকো। রুমাল নিয়ে আমি আর যাব না– এখানে দাঁড়াচ্ছি।

হুকুম মতো শুকলাম কাঠের ফ্রেম। সঙ্গেসঙ্গে নাকে ভেসে এল আলকাতরাজাতীয় একটা কড়া গন্ধ।

বেরোনোর সময়ে ওইখানেই প্রথম পা দিয়ে দিয়েছিল আততায়ী। গন্ধ যখন তোমার নাকে এসেছে টোবির নাকেও আসবে। যাও এবার নীচে গিয়ে কুকুরটাকে ছেড়ে দাও।

দৌড়ে বাইরে নেমে এলাম– ততক্ষণে শার্লক হোমস ছাদে উঠে পড়েছে। আলসের ওপর দিকে একটা অতিকায় জোনাকি পোকার মতো আস্তে আস্তে হাঁটছে। একসারি চিমনির আড়ালে ঢুকল হোমস, বেরিয়ে এল অপর দিক দিয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে গেল উলটোদিকে। আমি ঘুরে গিয়ে দেখলাম চালের প্রান্তভাগে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

ওয়াটসন নাকি?

হ্যাঁ।

এইখান থেকেই নেমেছিল। নীচে ওই কালোমতো জিনিসটা কী?

জলের পাইপ।

খাড়া করে বসানো?

হ্যাঁ।

ধারেকাছে মই দেখতে পাচ্ছ?

না।

কী সর্বনাশ! পড়লে যে ছাতু হয়ে যেতে হবে। তবে সে যখন উঠেছে, আমিও নামতে পারব। জলের পাইপ মজবুত বলে মনে হচ্ছে! নামছি।

খসখস আওয়াজ শুনলাম। ধীর স্থিরভাবে নেমে এল লণ্ঠনের আলো। লাফ দিয়ে পিপের ওপর নামল হোমস, সেখান থেকে মাটিতে।

জুতো মোজা পরতে পরতে বললে, খুব মুশকিল হয়নি পিছু নিতে। যেখানে যেখানে পা ফেলেছে, টালি আলগা করে গেছে। তাড়াহুড়োয় এই জিনিসটাও ফেলে গেছে। ডাক্তার তোমাদের ভাষাতেই বলি, আমার ডায়াগ্নোসিস যে নির্ভুল– এই জিনিসটাই তার প্রমাণ।

বলে যে-জিনিসটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, তা একটা রঙিন ঘাসের ছোট্ট থলি বা বটুয়া। গায়ে বসানো চটকদার পুঁতি। সাইজে বা চেহারায় সিগারেট কেসের চেয়ে বড়ো নয়। ভেতরে আধ ডজন কালো কাঠের কাটা। একদিকে ছুঁচোলো, আর একদিক চেঁছে গোল করা। বার্থোলোমিউ শোল্টোর কানের ওপর যা বেঁধা অবস্থায় দেখেছি হুবহু তাই।

হোমস বললে, খুব খারাপ জিনিস কিন্তু– শয়তানের অস্ত্রও বলতে পার। সাবধান, গায়ে ফুটিয়ে ফেলো না যেন। খুব সম্ভব এই ক-টা ছাড়া আর কাঁটা নেই। কাজেই আমি বেঁচে গেলাম। নইলে কে জানে কখন নিজের চামড়াতেই

এসে ফুটত একটা। মার্টিনি বুলেটকে বুক পেতে নিতে পারি— এই কাটাকে নয়। মাইল ছয়েক হাঁটার মতো মেজাজ আছে ওয়াটসন?

নিশ্চয় আছে, বললাম আমি।

তোমার পা পারবে তো?

আরে, হ্যাঁ খুব পারবে।

গুড ওল্ড টেবি! আয় টোবি কাছে আয়, নে, গন্ধ শোঁক, ভালো করে শোঁক!' ক্রিয়োসোট রুমালটা টোবির নাকের সামনে নাড়তে লাগল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে চার পা ফাঁক করে ঘাড় কাত করে এমন একটা হাস্যকর ভঙ্গিমায় দাঁড়াল চতুষ্পদ প্রাণীটা যেন ক্রিয়োসোট রুমাল নয়, বিখ্যাত দ্রাক্ষা-মদিরার আঘ্রাণ নিচ্ছে খুঁতখুতে গন্ধ বিশেষজ্ঞ। দূরে রুমাল ছুড়ে দিল হোমস। দো-আঁশলার কলারে একটা মোটা দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল পিপের গোড়ায়। জমির কাছে নাক নামিয়ে, ল্যাজটা শূন্যে তুলে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল আমাদের। টান টান হয়ে গেল হাতের দড়ি এবং পাল্লা দিয়ে প্রায় দৌড়েই চলতে হল আমাদের ;

পুবে আলো ফুটছে। ধূসর শীতল আভায় বেশ কিছুদূর দেখা যাচ্ছে। পেছনে বিষণ্ন বদনে একাকী দাঁড়িয়ে অতিকায় চৌকোনো পিণ্ডবৎ বাড়িটা। খাঁ-খাঁ করছে জানালাগুলো। বেজায় উঁচু ন্যাড়া, কালো দেওয়ালগুলোও বিষাদগ্রস্ত। জমিতে অনেক গর্ত, অনেক পরিখা। খোড়াখুড়ির জ্বালায় একটুকু জমিও আস্ত নেই। এইসব খানাখন্দ পাশ কাটিয়ে চলেছি তো চলেইছি। রাবিশ, আর্বজনাস্তুপ, আগাছা ঝোপ এবং সর্বোপরি একটা অশুভ ছায়াপাতে পুরো জায়গাটা যেন কুটিল ট্র্যাজেডির উপযুক্ত অকুস্থল হয়ে উঠেছে।

বাগানের প্রান্তে পৌছে পাঁচিল বরাবর দৌড়তে লাগল টোবি। নিজের লম্বা ছায়ায় নাক ডুবিয়ে গর গর করে গর্জেই চলেছে সমানে। তারপরেই থেমে গেল এক কোণে— সামনে একটা তরুণ বীচ গাছ। দুটো দেওয়াল যেখানে

মিশেছে, কয়েকটা ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। ফাকে ফাঁকে পা দিয়ে মইয়ের মতো ওঠানামার দরুন ক্ষয়ে গোল হয়ে এসেছে ইটগুলো। ইটের ফাঁকে পা দিয়ে হোমস উঠে পড়ল পাঁচিলের মাথায়, হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে কোলে দিয়ে নামিয়ে দিল পাশে।

আমি উঠে বসলাম পাঁচিলে। হোমস বললে– কেঠো-পাআলার হাতের ছাপ পড়েছে পাঁচিলে। সাদা চুনবালির ওপর রক্ত লেগেছে দেখেছ? কপাল ভালো, কাল থেকে তেমন ভারী বৃষ্টি হয়নি। আটাশ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও রাস্তায় গন্ধ আছে এখনও।

স্বীকার করছি, আমি কিন্তু যানবাহনবগুল লন্ডন রাজপথের দিকে তাকিয়ে মোটেই খরসা রাখতে পারিনি বন্ধুবরের কথায়। আটাশ ঘণ্টা কম নয়। এর মধ্যে কত গাড়িই-না গিয়েছে পথ বেয়ে। তবে আমার ভয় যে অমূলক সে-প্রমাণ মিলল অচিরে। মুহূর্তের জন্যেও টোবিকে দ্বিধাগ্রস্ত বা বেকুব হতে দেখলাম না। অতশত গন্ধের মধ্যে থেকে ক্রিয়োসোটের গন্ধটি ঠিক আলাদা করে নিয়ে একইভাবে অদ্ভুতভাবে হেলেদুলে এগিয়ে চলল রাস্তার মাঝ দিয়ে। যেতে যেতে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, ভেবো না যেন দৈবাৎ আততায়ীদের একজন ক্রিয়োসোটে পা ডুবিয়ে ফেলেছে বলে কেসটার সাফল্য নির্ভর করছে কেবল সেই সুযোগের ওপর। অনেক খবরই জানা গিয়েছে– কাজেই ও-সুযোগ ছাড়াও আরও অনেকভাবে আততায়ীদের টিকি ধরবার উপায় আমার জানা আছে। এই সুযোগটা অবশ্য একেবারে নাগালের মধ্যে এসে গেছে এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাও একটা অপরাধ। অবশ্য কেসটাকে যেমন বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছিল এই সুযোগের ফলে তা আর মনে হচ্ছে না। সূত্রটা এতই মামুলি যে কৃতিত্ব নেওয়ার মতো নয়।

বল কী? কৃতিত্ব আছে বই কী! জেফারসন হোপের মার্ডার কেসে তুমি যে বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখিয়েছিলে, আমার তো মনে হয় এ-কেসে এর মধ্যেই

তুমি তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা দেখিয়ে ফেলেছ। এ-কেস যেন আরও জটিল, আরও দুর্বোধ্য। উদাহরণস্বরূপ, কেঠো-পাআলা লোকটার নিখুঁত বিবরণ দিলে কী করে? যা বললে, তা তো বেশ জোরের সঙ্গেই বললে, বিশ্বাস কর বলেই বললে।

আরে ছ্যাঃ মাই ডিয়ার বয়? এ তো জলের মতো সোজা। নাটক করতে চাই না। একজন কয়েদি প্রহরীর কাছ থেকে দু-জন অফিসার গুপ্তধন সংক্রান্ত খবর পায়। জোনাথন স্মল নামে একজন ইংরাজ গুপ্তধনের একটা নকশা এঁকে অফিসারের হাতে তুলে দেয়! ক্যাপ্টেন মর্স্টানের জিনিসপত্রের মধ্যে এ-নাম দেখেছ মনে পড়ছে? ক্যাপ্টেন নিজের এবং স্যাঙাতদের তরফে সই দিয়েছিলেন নকশায়– নাটকীয়ভাবে এই সইকেই বলা হয়েছে 'চারের সংকেত' । অফিসাররা অথবা অফিসারদের একজন– এই নকশার দৌলতে মাটি খুঁজে উদ্ধার করে গুপ্তধন এবং নিয়ে আসে ইংলন্ডে। যে-শর্তে এনেছিল, ধরে নিচ্ছি সে-শর্ত সে রাখেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জোনাথন স্মল নিজে গুপ্তধন উদ্ধার করেনি কেন? উত্তর হাতের কাছেই রয়েছে। নকশায় যে-তারিখ বসানো, সে-তারিখে কয়েদিদের সংস্পর্শে ছিলেন ক্যাপ্টেন মর্স্টান। কয়েদিদের মধ্যে শাকরেদসহ জোনাথন স্মল ছিল বলেই নিজে গিয়ে তুলে আনতে পারেনি গুপ্তধনের বাক্স।

কিন্তু ভায়া। এ তো তোমার নিছক অনুমান, বললাম আমি।

তার চাইতেও বেশি। একমাত্র এই অনুমান দিয়েই সবক-টা ঘটনার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। উপসংহারকে এই অনুমানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলেই বুঝবে। গুপ্তধন আগলে বেশ কয়েক বছর পরম শান্তিতে কাটালেন মেজর শোল্টো। তারপরেই ভারতবর্ষ থেকে একটি চিঠি পেলেন। এক চিঠিতে ধাত ছেড়ে গেল তার– বিষম ভয় পেলেন। বলো তো চিঠিতে কী ছিল?

যাঁদের ঠকিয়েছেন তাদের ছাড়া পাওয়ার খবর। অথবা জেল থেকে তাদের পালানোর খবর। সেইটাই বেশি সম্ভব, কেননা উনি জানতেন নিশ্চয়

জেলের মেয়াদ ওদের ক-দিন। অস্বাভাবিকভাবে ছাড়া পাওয়ার খবর হলে এ-রকম আঁতকে উঠতেন না। তারপর কী করলেন? কেঠো-পাঅলা এক ব্যক্তির হঠাৎ হামলা থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করলেন। লোকটা কিন্তু ইউরোপের মানুষ– পয়েন্টটা মনে রেখো। তাই ইংরেজ ফেরিওলা দেখেই ভুল করে প্রাণের ভয়ে গুলি পর্যন্ত করে বসেছিলেন বেচারাকে। নকশায় সাদা চামড়া নাম একটাই আছে। আর সবাই হয় হিন্দু নয় মুসলমান। সাদা চামড়া আর কেউ নেই। বিনা দ্বিধায় দৃঢ়ভাবে তাই বলা যায় কেঠো-পাআলা লোকটা আর জোনাথন স্মল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। কী? যুক্তির মধ্যে ফাঁক আছে?

না। পরিচ্ছন্ন, সংক্ষিপ্ত।

বেশ, আবার তাহলে জোনাথন স্মলের জায়গায় নিজেদের বসানো যাক। তার দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটা দেখা যাক। সে ইংলন্ডে এল এক ঢিলে দু-পাখি মারবার মতলব নিয়ে। গুপ্তধন পুনরুদ্ধার এবং বেইমানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। শোল্টো কোথায় থাকেন তা জানবার পর খুব সম্ভব বাড়ির কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। লাল রাও নামে একজন খাস চাকর আছে শুনেছি, চেহারা এখনও দেখিনি। লোকটা যে মোটেই সুবিধের নয়, এ-রকম কথা শুনেছি মিসেস বার্নস্টোনের মুখে। কিছুতেই গুপ্তধনের হদিশ পেল না স্মল। কেউ জানে না কোথায় আছে বাক্সটা– দু-জন ছাড়া। মেজর স্বয়ং এবং একজন পরম বিশ্বাসী অনুচর– যে মারা গেছে অনেক আগেই। হঠাৎ খবর পেল স্মল, মেজর মৃত্যুশয্যায়, ক্ষিপ্তের মতো পাহারাদারদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সে ছুটে এল ভেতর-বাড়িতে পাছে গুপ্তধনের গুপ্ত ঠিকানা নিয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন মেজর এই ভয়ে। মেজরের শোবার ঘরের জানলার বাইরে এসেও ভেতরে ঢুকতে পারল না কেবল দুই ছেলে হাজির থাকার ফলে। জিঘাংসায়। উন্মত্ত অবস্থায় কিন্তু সেই রাতেই হানা দিল, ঘরের মধ্যে তছনছ করে গেল জিনিসপত্র– গুপ্তধনের ঠিকানা কিন্তু পেল না। যাবার সময়ে কার্ডের গায়ে 'চারের সংকেত' লিখে জানান দিয়ে গেল কে

এসেছিল। মেজরকে খুন করে বুকের ওপর চারের সংকেত' লেখা কার্ড রেখে যাওয়ার পরিকল্পনা নিশ্চয় আগে থেকেই ছিল। তার মাথার মধ্যে যাতে খুনটা স্বাভাবিক খুন বলে মনে না হয় এবং বোঝানো যায় যে চার শাকরেদের তরফ থেকে দণ্ড দিয়ে গেল একজন। অপরাধ ইতিহাসে এ ধরনের উদ্ভট আচরণ বা খামখেয়ালির নজির অনেক আছে। এ থেকে সাধারণত অপরাধী সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য এসে যায় অপরাধ বিশেষজ্ঞের হাতে। যা বলছি তা বুঝছ তো?

পরিষ্কার বুঝছি।

জোনাথন স্মল এখন করে কী? গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় গোপনে নজর রেখে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। মাঝে মাঝে ইংলন্ড ছেড়ে চলেও যায়, ফিরে আসে কিছুদিন পরে। এর পরেই আবিষ্কৃত হল গোপন চিলেকুঠরির হদিশ- সঙ্গেসঙ্গে খবর চলে গেল স্মলের কানে। তাহলেই দ্যাখ, বাড়ির মধ্যেই যে স্মলের স্যাঙাত আছে, সে-প্রমাণ পাচ্ছি আবার। কাঠের পা দিয়ে বার্থোলোমিউ শোল্টোর অত উঁচু ঘরে ওঠবার ক্ষমতা নেই স্মলের। তাই সঙ্গে নিল এমন একজন অদ্ভুত চোস্ত শাকরেদকে যে এই দুস্তর বাধা অক্লেশে টপকে গেলেও খালি পা ডুবিয়ে বসল ক্রিয়োসোটে– ফলে এল টোবি এবং আধা মাইনের একজন অফিসার তার জখম টেন্ডো অ্যাকিলিস নিয়ে খুঁড়িয়ে এল পাক্কা ছ-টি মাইল।

কিন্তু খুনটা তো জোনাথন করেনি- স্যাঙাত করেছে।

খুব সত্যি। তাতে খুবই চটেছে জোনাথন– ঘরে ঢুকেই দুমদাম করে পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করা দেখেই বুঝেছি। বার্থোলোমিউ শোল্টোর ওপর তিলমাত্র রাগ নেই তার– মুখে কাপড় ঠেসে হাত পা বেঁধে রাখলেই খুশি হত। ঝামেলায় মাথা গলাতে নারাজ। কিন্তু আর কিছু করার ছিল না– স্যাঙাতের বর্বর প্রবৃত্তি ষোলোকলায় প্রকাশ পেয়েছে– বিষ-মাখানো কাঁটার কাজ ভালোভাবেই শেষ হয়েছে– কাজেই 'চারের সংকেত' লেখা কার্ড ফেলে জানান দিয়ে গেল স্মল– রত্নবাক্স নামিয়ে দিলে নীচে- সব শেষে নামল নিজে। এই পর্যন্ত ঘটনা

পরম্পরা ছাড়া করতে পেরেছি সূত্র আর সংকেতের রহস্যভেদ করে। সে যে মধ্যবয়সি আর

খুব কঠিন নয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করেছিল সে। দু-পায়ের মাঝে ব্যবধান দেখে আঁচ করেছি উচ্চতা কতখানি। গালে দাঁড়ি যে আছে, তাও জানি। জানলায় তার মুখ দেখে আঁতকে উঠেছিল থেডিয়াস শোল্টো কেবল ওই দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের জন্যেই। আর কিছু বলবার তো দেখছি না।

স্যাঙাতটা সম্বন্ধে বল।

ও-ব্যাপারে খুব একটা রহস্য নেই। শিগগিরই সব জানবে। কী মিষ্টি সকাল দেখেছ? ছোট্ট ওই মেঘটা কীরকম উড়ে যাচ্ছে দেখ- ঠিক যেন একটা দানব ফ্ল্যামিঙ্গের গা থেকে খসে-পড়া গোলাপি পালক। লন্ডনের ওপরকার মেঘ ঠেলে মাথা তুলেছে সূর্যের লাল রং। উষার রাঙা আলোয় অনেকেই এখন নেয়ে উঠেছে– আমরা দু-জন ছাড়া– অদ্ভুত পথের পথিক হয়েছি বলে! প্রকৃতির পঞ্চভূতের এই মহান শক্তির সামনে নিজেদের ক্ষুদ্র উচ্চাশা আর প্রচেষ্টা কত তুচ্ছ বল তো? জাঁ পল পড়েছ তো?

মোটামুটি। কারলাইল" পড়তে পড়তে জাঁ পলে পৌছেছি।

লেক থেকে ছোটোখাটো যেসব নদী বেরোয়, তাদের যেকোনো একটাকে ধরে এগোলে লেকেই পৌছানো যায়। তোমার ব্যাপারটাও হয়েছে তাই। অদ্ভুত কিন্তু ভাববার মতো একটা কথা বলেছেন উনি। কোনো মানুষ কত মহান তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মেলে তার নিজেদের ক্ষুদ্রতার সম্যক উপলব্ধিতে অর্থাৎ তুলনামূলক বিচার আর উপলব্ধি দিয়েই নিজেই নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করেন। রিচটারের কথায় এমনি অনেক চিন্তার খোরাক আছে। তোমার তো পিস্তল নেই, না?

ছড়ি আছে।

বিবরে পৌছোনোর পর হয়তো হাতাহাতি হতে পারে। জোনাথনকে তুমি সামলাবে। কিন্তু স্যাঙাতটা যদি বেগড়বাই করে তো গুলি করে মারব।

বলতে বলতে রিভলবার বার করে হোমস। দুটো চেম্বারে গুলি ভরে রেখে দিল কোটের ডান-হাতি পকেটে।

টোবির পেছন পেছন এসে পড়েছি বিশাল নগরীর উপান্তে আধা-গ্রামের মতো পল্লিতে– দু-পাশে সারি সারি ভিলা। রাস্তার পর রাস্তায় শুরু হয়েছে ভোরের তৎপরতা। খালাসি মেহনতি মানুষরা উঠেছে ঘুম থেকে। নোংরা মেয়েমানুষেরা খড়খড়ি খুলে দিয়ে বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করছে চৌকাঠ। কোণের চৌকোনা-ছাদ পাবলিক হাউসগুলোর কাজকর্ম সবে শুরু হয়েছে। চোখ-মুখ ধুয়ে রুক্ষ চেহারার পুরুষরা বেরিয়ে এসে জামার হাতা দিয়ে দাড়ি ঘষছে। রাস্তার কুকুরগুলো টহল দিচ্ছে আনাচে কানাচে। অবাক চোখে দেখছে আমাদের। কিন্তু তুলনা নেই টোবির। রাস্তা ছাড়া হুশ নেই কোনোদিকে। একভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে গন্ধ শুকে এগিয়ে চলেছে। আর মাঝে মাঝে গরগর করে উঠে জানান দিচ্ছে যে গন্ধ এখনও বেশ উগ্র।

স্ট্রেটহাম, ব্রিক্সটন, ক্যামবারওয়েল পেরিয়ে এলাম। ঢুকলাম কেনিংটন লেনে। গলিখুঁজির মধ্য দিয়ে পৌঁছোলাম ওভালের পুবদিকে। যাদের পেছন নিয়েছি, তারা যেন ইচ্ছে করেই সোজা সড়ক ছেড়ে গলিখুঁজির মধ্যে একেবেঁকে চলেছে– যাতে পেছন নিয়েও নাগাল ধরা না-যায়। মূল সড়কের সরু গলি থাকলে সেই গলি দিয়েই হেঁটেছে– মূল সড়ক মাড়ায়নি। কেনিংটন লেনের শেষে পৌছে বাঁ-দিকে বেঁকে বন্ড স্ট্রিট আর মাইলস স্ট্রিট ধরেছে। মাইলস স্ট্রিট যেখানে নাইটস প্লেসে মোড় নিয়েছে, ঠিক সেইখানে গিয়ে আর এগোল না টোবি। এক কান খাড়া করে, আর এক কান ঝুলিয়ে অস্থিরভাবে একবার যায় সামনে, আবার পেছিয়ে আসে পেছনে। দোটানায় পড়লে কুকুরমহল যা করে– হুবহু সেই চিত্র।

তারপর গোল হয়ে ঘুরতে লাগল হেলেদুলে– ঘনঘন তাকাতে লাগল আমাদের দু-জনের দিকে– গোলমালে পড়ে যেন সহানুভূতি প্রার্থনা করছে।

হল কী কুকুরটার? গর গর করে ওঠে হোমস। বেলুনে চেপে নিশ্চয় উড়ে যায়নি। ছ্যাকড়াগাড়িও নেয়নি দুশমন দু-জন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বোধ হয়। বললাম আমি।

আ! এই তো আবার এগোচ্ছে। স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বললে বন্ধুবর। সত্যিই আবার এগোচ্ছে টোবি। গন্ধ শুকতে শুকতে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলে এমন বেগে একদিকে ধেয়ে গেল তাক লেগে গেল আমার। এত উৎসাহ এত প্রত্যয় তো আগে দেখিনি। গন্ধ নিশ্চয় আরও উৎকট এখানে, কেননা রাস্তায় নাক নামানোর আর দরকারও হচ্ছে না– দড়িতে প্রবল টান মেরে ছুটছে সামনে– ছুটতে হচ্ছে আমাদেরকেও। হোমসের প্রদীপ্ত চোখ দেখে বুঝলাম যাত্রাপথের শেষ ঘনিয়ে এসেছে।

নাইন এলমস বরাবর প্রায় ছুটতে ছুটতে হোয়াইট ইগল পানশালার পাশ দিয়ে এলাম ব্রোডরিক অ্যান্ড নেলসনের কাঠের গোলায়। ক্ষিপ্তের মতো পাশের গেট দিয়ে ভেতরের চত্বরে ঢুকে পড়ল টোবি- লোকজন তখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত সেখানে। করাত দিয়ে ঘস ঘস করে কাঠ কাটা চলছে। টোবি কিন্তু আমাদের হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল কাঠের গুড়ো আর কাঠের কুচোর মাঝখান দিয়ে একটা গলির মধ্যে। সেখান থেকে একটা চওড়া পথ পেরিয়ে, দু-দিকে কাঠের স্তুপের মাঝখান দিয়ে একটা ঠেলাগাড়ির সামনে। ঠেলাগাড়ির ওপরে বসানো একটা মস্ত পিপের ওপরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিজয়গর্বে ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। সে কী উল্লাস। জ্বলজ্বলে চোখে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে এবং লকলকে জিব বার করে লালা ফেলতে ফেলতে পিপের ওপর পিঠটান করে দাঁড়িয়ে বাহবার আশায় পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগল আমার

আর হোমসের মুখের দিকে। ঠেলাগাড়ির চাকা আর পিপের তক্তায় লেগে একটা কালচে তরল পদার্থ এবং বাতাস ভারী রয়েছে ক্রিয়োসোটের কটু গন্ধে।

শূন্য দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি আর শার্লক হোমস, পরক্ষণেই পেট ফাটা হাসির দমকে যুগপৎ ভেঙে পড়লাম দু-জনে।

৮। বেকার-স্ট্রিটের ছন্নছাড়া বাহিনী

বললাম, এবার কী করবে বল? টোবি আর অভ্রান্ত বলা যায় না– সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে।

ও যা পেয়েছে, সেই অনুযায়ীই কাজ দেখিয়েছে, পিপের ওপর থেকে টোবিকে নামিয়ে কাঠের গোলার বাইরে হটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললে হোমস। সারাদিনে লন্ডন শহরে কত ক্রিয়োসোটের গাড়ি চলে তা যদি ভাবো তো বুঝবে বেচারার গন্ধ গুলিয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এখানেও গন্ধ আরও উগ্র এই কারণে যে কাঠ সিজন করার জন্য ক্রিয়োসোটের দরকার। টোবির আর দোষ কী বল।

যে-গন্ধ ধরে বেরিয়েছিলাম, সেই গন্ধেই এখন ফিরে যাওয়া উচিত, তাই না?

হ্যাঁ। কপাল ভালো বেশিদূর যেতে হবে না। নাইটস প্লেসে দু-দিকে দুটো গন্ধ পেয়ে টোবি বেচারি গোলমালে পড়েছিল। তখন এগিয়েছিল ভুল গন্ধ ধরে, এখন এগোবে ঠিক গন্ধ ধরে।

খুব একটা অসুবিধে হল না ঠিক গন্ধ খুঁজে নিতে। গোলমালে যেখানে পড়েছিল, সেইখানে টোবিকে নিয়ে যেতেই বাই বাই করে এক চক্কর ঘুরে নিয়েই তিরের মতো ছিটকে গেল নতুন একদিকে।

আমি বললাম, দেখ আবার ক্রিয়োসোট পিপে এসেছে যেখান থেকে, সেখানেই না টেনে নিয়ে যায় আমাদের।

সে-সম্ভাবনাও ভেবেছি। কিন্তু পিপে এসেছে মাঝ রাস্তা দিয়ে– ও চলেছে ফুটপাত দিয়ে। না হে, এবার ঠিক গন্ধই ধরেছে টোবি।

গন্ধের পেছন নিয়ে বেলমন্ট প্লেস আর প্রিন্সেস স্ট্রিটের মধ্যে পৌঁছোলাম। নদীর ধারে ব্রড স্ট্রিটের শেষে টোবি সোজা দৌড়ে নেমে গেল নদীর

পাড়ে — সামনে একটা ছোটো কাঠের জেটি। জেটিতে উঠে একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল কালো স্রোতের পানে তাকিয়ে।

কপাল মন্দ আমাদের, বললে হোমস। ওরা তো দেখছি নৌকো নিয়েছে। কতকগুলো ছোটো ছোটো শালতি আর ডিঙি নৌকো ভাসছিল জলে আর জেটির ধারে। প্রত্যেকটার কাছে নিয়ে গেলাম টোবিকে, গন্ধ শুকল টোবি, কিন্তু ঠিক গন্ধ পেয়েছে এমন লক্ষণ দেখাল না।

জেটির কাছে একটা ইটের ছোটো বাড়ি দেখলাম। দ্বিতীয় জানালার সামনে একটা কাঠের বিজ্ঞাপন-পত্র। বড়ো বড়ো হরফে লেখা 'মর্ডেকাই স্মিথ ' , তলায় লেখা– দিন বা ঘণ্টা হিসেবে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। দরজার ওপর একটা লেখা পড়ে জানা গেল একটা লঞ্চও ভাড়া পাওয়া যায়। জেটিতে স্তূপীকৃত কয়লা দেখে বুঝলাম কথাটা সত্যি। চারপাশে দেখল শার্লক হোমস– অমনি সংকেত দেখা গেল চোখে-মুখে।

বলল, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। লোকগুলোকে যা ভেবেছিলাম দেখছি তার চাইতেও বেশি ধুরন্ধর। পিছু নিয়ে যাতে ধরা না-যায়, সে-ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল এখানে।

দরজার দিকে এগোচ্ছে হোমস। এমন সময়ে কোঁকড়া চুলো ছ-বছর বয়সের একটা ছেলে তিরবেগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে– পেছন পেছন চেঁচাতে চেঁচাতে এল লালমুখো মোটাসোটা এক স্ত্রীলোক– হাতে একটা মস্ত স্পঞ্জ।

জ্যাক ফিরে আয় বলছি। চান করে যা, নোংরা ভূত কোথাকার। তোর বাবা ফিরে এসে যদি তোকে এই অবস্থায় দেখে দু-জনকেই শেষ করে ছাড়বে।

এই সুযোগ! চেঁচিয়ে উঠল হোমস, আয় খোকা! কী দুষ্টু! কী দুষ্টু! গাল দুটো তো দেখছি গোলাপের মতো সুন্দর! জ্যাক, বল দেখি কী তোর চাই?

এক মুহূর্ত ভেবে নিল ছেলেটা।

তারপর বললে, একটা শিলিং।

ব্যাস? আর কিছু না?

দুটো শিলিং। আবার একটু ভেবে নিয়ে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাল শিশুটি।

এই নে! লুফে নে!— ভারি সুন্দর ছেলে আপনার, মিসেস স্মিথ!

আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ছেলে আমার সুন্দর তো বটেই; তবে বড্ড দুষ্টু। একদম সামলাতে পারি না– বিশেষ করে কর্তা যদি একটানা ক-দিন বাইরে যায়।

বাইরে গেছেন নাকি? নিরাশ কণ্ঠে বললে হোমস; কী কপাল আমার। মি. স্মিথের সঙ্গে যে কথা ছিল আমার।

কাল সকাল থেকেই বেরিয়েছে বাইরে। সত্যি কথা বলতে কী এবার একটু ভয়-ভয় করছে আমার। নৌকো যদি চান তো বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি চাই মি. স্মিথের স্টিম লঞ্চটা।

আরে মশাই, সে তো স্টিম লঞ্চ নিয়েই বেরিয়েছে। ভয় হচ্ছে তো সেইজন্যেই। উলউইচে গিয়ে ফিরে আসার মতো কয়লা তো নেই লঞ্চে। বজরা নিয়ে বেরোলে অত ভাবতাম না। গ্রেভসেন্ডে অনেক কাজ নিয়ে গেছে– দেরি হয়ে গেলে থেকেও গিয়েছে। কিন্তু কয়লা ছাড়া স্টিম লঞ্চ নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি যে অনেক।

নদীর ধারে কোনো জেটি থেকে কিনে নেবে খন!

নিলে তো হয়, কিন্তু সে-পাত্র ও নয়। দাম নিয়ে ঝগড়া করে মরবে। কত কথাই কানে আসে এ নিয়ে। বস্তা কয়েক কয়লার জন্যে দু-চার পয়সা বেশি তো দেবেই না, উলটে গলাবাজি করে ভূত ছাড়িয়ে দেবে। তা ছাড়া কেঠো-পাআলা ওই লোকটা সুবিধের নয়। দেখতে কদাকার, কথায় অদ্ভুত টান। যখন-তখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে চায় কী বলতে পারেন?

ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে হোমস বলল, কেঠো পা-আলা লোক?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মুখখানা বাদরের মতো বাদামি। যখন-তখন এসে ডেকে তোলে আমার কর্তাকে। কাল রাতে সে-ই ডেকে নিয়ে গেল কর্তাকে। কর্তাটিও কম নয়। জানত লোকটা আসবে– স্টিম তুলে রেখেছিল লঞ্চে। আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই স্যার, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, ভাবগতিক ভালো মনে হচ্ছে না।

দু-কাঁধ বাঁকিয়ে হোমস বললে, আপনি বোধ হয় অকারণে ভয় পাচ্ছেন, মিসেস স্মিথ। কাল রাতে যে কেঠো-পাঅলাই এসেছিল জানছেন কী করে? এত নিশ্চিত বলছেন কী করে বুঝছি না।

গলা শুনে স্যার, গলা শুনে। ও গলা আমি হাড়ে হাড়ে চিনি– যেমন মোটা তেমনি জড়ানো। টক টক করে টোকা মারল জানলায়– রাত তখন তিনটে হবে। হেঁড়ে গলায় বললে, উঠে পড়ো দোস্ত! সময় হয়েছে। শুনেই আমার বড়ো ছেলে জিমকে ঘুম থেকে তুলে বেরিয়ে গেল কর্তা সঙ্গে নিয়ে। কেঠো-পায়ের খটখট আওয়াজ শুনলাম পাথরের ওপর।

কেঠো পা-আলা লোকটার সঙ্গে আর কেউ ছিল?

বলা মুশকিল। আর কারো গলা তো শুনিনি।

মিসেস স্মিথ আমার কপাল মন্দ। স্টিম লঞ্চ ভাড়া নেব বলেই এসেছিলাম। তার বদলে লঞ্চ সম্বন্ধে কত খবরই না-পেলাম– ভালো কথা, নাম কী লঞ্চের?

অরোরা।

আ! সবুজ লঞ্চ তো? পুরোনো রং হলদে লাইন কাটা? কড়ি খুব চওড়া?

মোটেই না। পাতলা ছিপছিপে। এই সেদিন রং করা হয়েছে– কালোর ওপর জোড়া লাল লাইন।

ধন্যবাদ। আশা করি মি. স্মিথের খবর শিগগিরই পেয়ে যাবেন। আমাকে তো বেরোতেই হবে নদীতে, অরোরার দেখা পেলে জানিয়ে দেব আপনি উদবেগে আছেন। কালো চিমনি বললেন না?

আজ্ঞে না। কালোর ওপর সাদা বেড়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে। কালো রং তো পাশের দিকটা। গুড মর্নিং মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন, ওই তো একটা পানসি রয়েছে, মাঝিও রয়েছে। চলো ওতেই নদী পেরোনো যাক।

পানসিতে উঠে বসবার পর হোমস বললে, এ ধরনের লোকদের পেট থেকে কথা বার করার প্রথম কায়দা হল কখনো ওদের ভাবতে দিতে নেই যে কথাগুলো তোমার কাজে লাগবে– তাহলে শুক্তির মতো খটাস করে মুখের ডালা সেঁটে বসে থাকবে। বরং প্রতিবাদের সুরে যা বলবে তার মধ্যেও হাড়ির খবর বেরিয়ে আসবে– এখন যা করলাম।

পথ পরিষ্কার মনে হচ্ছে, বললাম আমি।

কী করতে চাও?

একটা লঞ্চ ভাড়া করে নদীতে বেরিয়ে পড়তে চাই- অরোরাকে খুঁজতে চাই।

ভায়া, কাজটা বিরাট। এখান থেকে গ্রিনউইচ পর্যন্ত নদীর দু-ধারে যেকোনো জেটি অরোরা ছুঁয়ে যেতে পারে। ব্রিজের তলায় তো অসংখ্য জেটির একটা গোলকধাঁধা হয়ে রয়েছে। মাইলের পর মাইল শুধু জেটি আর জেটির গলিখুঁজি। একা খুঁজতে গেলে অনেকদিন লাগবে, তোমার দমও ফুরিয়ে যাবে।

তাহলে পুলিশ লেলিয়ে দাও।

না! অ্যাথেলনি জোন্সকে ডাকতে পারি শেষ মুহূর্তে। লোক সে খারাপ নয়– পেশার দিক দিয়ে যাতে তার ক্ষতি না হয়, সে-ব্যবস্থাও আমি করব। তবে অ্যাদ্দুর যখন এগিয়েছি, শেষ পর্যন্ত একাই চালিয়ে যেতে চাই তদন্ত।

জেটির মালিকদের কাছে খবর চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয় না?

তাতে আরও খারাপ হবে! যাদের পেছনে ছুটেছি, তারা টের পেয়ে যাবে যে আমরা পিছু নিয়েছি– দেশ ছেড়ে তখন লম্বা দেবে। দেশের বাইরে যাওয়ার জন্যে এখনো তারা তৈরি, কিন্তু তাড়াহুড়ো করছে না নিশ্চিন্ত আছে বলে। জোন্সের উৎসাহ উদ্যম একদিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগছে। কেননা, কেস সম্বন্ধে ওর ধারণা খবরের কাগজে ছাপা হবেই, পলাতকরাও মনে করবে বিপথে চলেছে প্রত্যেকেই।

মিলব্যাঙ্ক পেনিটেনসিয়ারির কাছে পানসি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলাম–

তাহলে এখন কী করব?

গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি যাবে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেবে– কেননা আজ রাতে ফের বেরুতে হবে। গাড়োয়ান, টেলিগ্রাফ অফিসে দাঁড়িয়ে যেয়ো! টোবিকে কাছে রাখব– ফের দরকার হতে পারে।

গ্রেট পিটার স্ট্রিট পোস্ট অফিসে গিয়ে ভাড়াটে গাড়ি দাঁড়াল। একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস। চলমান গাড়িতে বসে বললে– বল দিকি কাকে পাঠালাম?

জানলে তো বলব।

জেফারসন হোপ কেসে গোয়েন্দা পুলিশবাহিনীর বেকার স্ট্রিট ডিভিশনকে কাজে লাগিয়েছিলাম মনে পড়ে?

তাই নাকি? হেসে ফেললাম আমি।

ঠিক এই ধরনের কেসেই ওদের ভীষণ দরকার– বিকল্প হয় না। যদি না-পারে, অন্য ব্যবস্থা করব– কিন্তু প্রথম সুযোগ ওদের। টেলিগ্রামটা পাঠালাম আমার পুঁচকে নোংরা লেফটেন্যান্ট উইগিন্সকে। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই আশা করি দলবল নিয়ে এসে যাবে ছোকরা।

সারারাত উত্তেজনার ধকল এখন অনুভব করছিলাম শরীরের মধ্যে। সময়টা তখন সকাল আটটা আর ন-টার মাঝামাঝি। খোড়াচ্ছিলাম, নেতিয়ে পড়ছিলাম, দেহমনে প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছিলাম– এক কথায় ধুকছিলাম। আমার বন্ধুটির মতো পেশাদার উদ্দীপনা আমার নেই– সমস্যাকে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে মাথা ঘামাতেই পারি না। বার্থোলোমিউ শোল্টোর মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু লোকটা সম্বন্ধে এত খারাপ কথা শুনেছি যে তার হত্যাকারীদের ওপর তিলমাত্র বিদ্বেষ আমার নেই। গুপ্তধনটা অবশ্য একটা আলাদা ব্যাপার। সবটা, অথবা কিছুটা, ন্যায্যত প্রাপ্য মিস মর্স্টানের। জীবন দিয়ে উদ্ধার করব সেই সম্পদ, উদ্ধারের সম্ভাবনা যখন সমুজ্জ্বল। এও ঠিক যে রত্নপেটিকা পাওয়ার পর চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে যাবেন মিস মর্স্টান। কিন্তু এ-ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে ভালোবাসাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়ে পঙ্কিল করে তোলা। হোমস যদি অপরাধী অন্বেষণে এত মেহনত করতে পারে– তাহলে আমিই-বা অজানা সম্পদ উদ্ধারে জীবনপাত করতে পারব না কেন? ও যে-কারণে ক্রিমিনাল খুঁজছে, তার চাইতে দশগুণ জোরালো কারণে আমি খুঁজব রত্নপেটিকা।

বেকার স্ট্রিটে ফিরে স্নান সেরে জামাকাপড় পালটে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে দেখলাম ব্রেকফাস্ট তৈরি। কফি ঢালছে হোমস।

দেখে যাও হে। হাসতে হাসতে খোলা খবরের কাগজের এক জায়গা দেখিয়ে বললে ও, পরমোৎসাহী জোন্স আর সর্বব্যাপী সাংবাদিক মিলেমিশে কাজটা শেষ করে এনেছে। খাওয়ার পরে দেখ- এ-কেসের অনেক খবরই তোমার জানা– ডিম আর শূকরের উরুর সদব্যবহার করো আগে।

কাগজটা হাত থেকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিটা পড়লাম– শিরোনামায় লেখা রয়েছে: 'আপার নরউডে রহস্যজনক কাণ্ড।'

স্ট্যান্ডার্ডের খবর! ‘কাল রাত বারোটায় আপার নরউডস্থ পণ্ডিচেরি লজ নিবাসী মি. বার্থোলোমিউ শোল্টোকে যেভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তার ঘরে, তাতে মনে হয় একটা ঘোর ষড়যন্ত্র রয়েছে এর মধ্যে। যদ্দূর জানা গিয়েছে, মি. শোল্টোর শরীরে মারধরের চিহ্ন নেই, তবে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভারতবর্ষ-থেকে-আনা রত্নরাজিপূর্ণ একটি পেটিকা উধাও হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ভাই মি. থেডিয়াস শোল্টোর সঙ্গে পণ্ডিচেরি লজে গিয়েছিলেন মি. শার্লক হোমস এবং ডা. ওয়াটসন– রত্নপেটিকা চুরির বিষয়টি তারাই প্রথম লক্ষ করেন। ভাগ্যক্রমে গোয়েন্দা পুলিশবাহিনীর বিখ্যাত অফিসার মি. অ্যাথেলনি জোন্স সেই সময়ে নরউড পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির ছিলেন- খবর পেয়েই আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি অকুস্থলে হাজির হন। সুদীর্ঘ অনুশীলন আর অভিজ্ঞতার দরুন তিনি দ্রুত তদন্ত পরিচালনা করে অপরাধীদের ধরে ফেলেন এবং মৃত ব্যক্তির ভাই থেডিয়াস শোল্টোসহ হাউসকিপার মিসেস বার্নস্টোন, ভারতীয় খাস চাকর লাল রাও এবং দারোয়ান বাকুলি ম্যাকমুর্ডোকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। বাড়ির সব কিছুই নখদপর্ণে ছিল চোর বা চোরেদের। কেননা মি. জোন্সের সুবিখ্যাত বিশেষ জ্ঞানের দৌলতে এবং অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ফলে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে দুষ্কৃতকারীরা জানলা বা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেনি– ঢুকেছে ঘরের ছাদ ফুটো করে। সেই ফুটো দিয়ে চিলেকোঠায় ওঠা যায় এবং চিলেকোঠা থেকে ঠেলা দরজা দিয়ে ছাদে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এই পথেই আততায়ীরা ঘরে এসেছে এবং এই ঘরেই পাওয়া গিয়েছে মৃতদেহ। এটা যে নিছক সুপরিকল্পিত, সিঁধকাটা চুরি নয়, উপযুক্ত ঘটনা থেকেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। আইনরক্ষক অফিসারদের দ্রুত এবং উদ্দীপনাপূর্ণ তৎপরতার ফলে দেখা গেল এসব ক্ষেত্রে শক্তিমান এবং তেজস্বী পুরুষ যদি একজনও হাজির থাকেন তার কত সুফল দেখা যায়। গোয়েন্দাদের বিকেন্দ্রীকরণ যারা পছন্দ করে এই ঘটনা তাদের দাবিকে জোরদার

করবে। এর ফলে আরও ফলপ্রদভাবে গোয়েন্দারা নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবেন।

দারুণ জমকালো, তাই না? কফির কাপ ঠোঁটের কাছে ধরে কাষ্ঠ হাসি হাসে হোমস। কী মনে হয় তোমার?

আমার তো মনে হয় একই অপরাধে গ্রেপ্তার হতে হতে বেঁচে গেছি আমরা।

আমারও তাই মনে হয়। এখনও খুব নিরাপদ বোধ করছি না। উৎসাহ নতুন করে মাথা চাড়া দিলে জোন্স এখানেও দৌড়ে আসতে পারে হাতকড়া নিয়ে।

ঠিক এই সময়ে খুব জোরে বেজে উঠল সদর দরজার ঘণ্টা– যুগপৎ শোনা গেল মিসেস হাডসনের নৈরাশ্য ও অনুযোগ মিশানো কাংস্যকণ্ঠ।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম– সর্বনাশ। হোমস, পুলিশ দেখছি সত্যিই এসে গেল।

পরিস্থিতি এখনও অতটা খারাপ হয়নি, ওয়াটসন। এরা আমার বেসরকারি পুলিশবাহিনী– বেকার স্ট্রিটের ঠিকে গোয়েন্দাদের দল।

কথা শেষ হতে-না-হতেই অনেকগুলো খালি পায়ের দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়িতে, সেইসঙ্গে উচ্চকণ্ঠের হট্টগোল, পরমুহূর্তেই হুড়মুড় করে ঘরে ধেয়ে এল ছেড়া জামাকাপড় পরা, ধূলিধূসরিত, নোংরা চেহারার একদল ছন্নছাড়া রাস্তার ছেলে। মহা হইচই করে প্রবেশ করলেও দেখা গেল নিয়মানুবর্তিতা বস্তুটার কিছু তাদের জানা আছে। কেননা, ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে চক্ষের নিমেষে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের সামনে এবং চেয়ে রইল সাগ্রহ মুখে। এদের মধ্যে একজন মাথায় বড়ো, বয়সেও বড়ো, যাচ্ছেতাই এই কাকতাড়ুয়াদের মধ্যে সেই যেন কেষ্টবিষ্টু, এইরকম একটা হাস্যকর খানদানি ভাব নিয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে।

বলল, আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই ঝটপট দলবল নিয়ে চলে এলাম স্যার। টিকিটের দাম সাড়ে তিন শিলিং দেবেন।

এই নে, খুচরো পয়সা দিল হোমস। উইগিন্স, এরপর ওরা খবর পাঠাবে তোর কাছে– তুই এসে খবর দিয়ে যাবি আমাকে। এভাবে বাড়িতে হামলা বরদাস্ত করব না। যাই হোক, কী করতে হবে সবাই শুনে যা! একটা স্টিম লঞ্চ খুঁজছি আমি– কোথায় কীভাবে আছে খবর দিতে হবে; লঞ্চের নাম অরোরা– মালিকের নাম মর্ডেকাই স্মিথ, কালো রঙের লঞ্চ– দু-পাশে দুটো লাল ডোরা, ফানেল কালো রঙের, সাদা বেড আছে। নদী যেদিকে সমুদ্রের দিকে গেছে– ওইদিকেই কোথাও পাবে লঞ্চটাকে। মর্ডেকাই স্মিথের জেটি হল মিলব্যাঙ্কের উলটাে দিকে– একজন ছেলে থাকবে সেখানে– লঞ্চ ফিরলেই খবর দেবে। নদীর দু-পাড়েই চোখ রাখতে হবে– ঠিক করে নে, কে কোথায় যাবি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবি। পরিষ্কার হয়েছে তো?

ইয়েস গভর্নর' , বলল উইগিন্স।

মাইনে পাবি আগের হারে– নৌক যে দেখতে পাবে, সে পাবে একটা মোহর। এই নে অগ্রিম। যা, ভাগ এখন।'

প্রত্যেকের হাতে একটা শিলিং দিল হোমস। বোঁ-বোঁ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ছন্নছাড়া বাহিনী। তারপরেই দেখলাম ছুটছে রাস্তা দিয়ে!

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাল হোমস। বলল, লঞ্চ যদি জলের ওপর থাকে, ওদের চোখে পড়বেই। ওরা সর্বত্র যেতে পারে, সমস্ত দেখতে পারে, সবার কথা পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পারে। মনে হয় আজ রাত্রেই আসবে খবর। যতক্ষণ না তা পাওয়া যায়, ততক্ষণ ছিন্নসূত্রেই খেই ধরা যাবে না। আমাদেরও কিছু করার নেই। অরোরা বা মর্ডেকাই স্মিথের খবর না-পাওয়া পর্যন্ত বসে থাক গ্যাট হয়ে।

এঁটোকাটাগুলো খাইয়ে দিচ্ছি টোবিকে। একটু ঘুমিয়ে নেবে? বললাম আমি।

না। আমি ক্লান্ত নই। অদ্ভুত ধাত আমার। ধকল সইতে পারি আশ্চর্যভাবে, কাজ করে ক্লান্ত হয়েছি কখনো মনে পড়ে না– কিন্তু নিষ্কর্ম থাকলে একেবারে কাহিল হয়ে যাই। সুন্দরী মক্কেলের অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে এখন তামাক খেতে খেতে চিন্তা করব। কাজটা অবশ্য খুবই সোজা– এর চাইতে সোজা কাজ পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। কেঠো পা-অলা লোক চট করে পড়ে না মানছি, কিন্তু অন্য লোকটা জানবে একেবারেই অসাধারণ।

আবার সেই লোকের কথা এসে গেল!

লোকটাকে নিয়ে তোমার কাছে রহস্য তৈরি করতে চাই না। কিন্তু লোকটা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয় ভেবেছ। টুকটাক খবর আর তথ্য যা পেয়েছ তার ভিত্তিতেই চিন্তা কর না কেন। আকারে ছোট্ট পায়ের ছাপ, আঙুলগুলো ফাঁক-ফাঁক, বুটের চাপে সাজানো আঙুল নয়, খালি পা, পাথর বাঁধা কাঠের গদা, দারুণ চটপটে, বিষ মাখানো খুদে তির। বল, কী বুঝলে এ থেকে?

বর্বর। বললাম সবিস্ময়ে। জোনাথন স্মলের ভারতীয় শাগরেদের কেউ নিশ্চয়!

মোটেই তা নয়। বিদঘুটে অস্ত্র দেখে প্রথমে তাই ভেবেছিলাম, পায়ের ছাপের বৈচিত্র্য লক্ষ করে অন্য ধারণা মাথায় এসেছে। ভারতবর্ষ উপদ্বীপের বাসিন্দারা কেউ কেউ মাথায় খাটো হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের পায়ের ছাপ কম হয় না। খাঁটি হিন্দুদের পা লম্বা আর পাতলা। চটি-পরা মুসলমানদের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুল থেকে তফাতে থাকে– মাঝে চটির চামড়ার ফিতে থাকে বলে। ছোটো ছোটো এই তীরগুলো ছুঁড়তে হলে একটিমাত্র পন্থাতেই ছুড়তে হয় এবং তা ব্লোপাইপ থেকে– ফুঁ দেওয়া নল থেকে। এ ধরনের বর্বর কোথায় থাকে বল তো?

'দক্ষিণ আমেরিকায়'   ঢোক গিলে বললাম।

লম্বা হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা মোটা বই নামিয়ে আনল হোমস। বইখানা সদ্য প্রকাশিত– ভৌগোলিক শব্দ কোষের প্রথম খণ্ড। সর্বাধুনিক তথ্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ। দেখ কী লেখা রয়েছে। সুমাত্রা থেকে ৩৪০ মাইল উত্তরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। হুম? হুম! দেখ, দেখ, আরও কত কী খবর! আর্দ্র আবহাওয়া, প্রবাল প্রাচীর, হাঙর, পোর্ট ব্লেয়ার, দ্বীপান্তর কয়েদিদের ব্যারাক, রাটল্যান্ড দ্বীপ, কটন উডস,– আ! এই তো পেয়েছি! বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে জাত বোধ হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা। কিছু নৃতত্ত্ববিদ অবশ্য এ-সম্মান দিতে চান আফ্রিকার বুশমেনদের, আমেরিকা ডিগার ইন্ডিয়ানদের এবং টিয়েরা ডেল ফুয়েজিয়ান্সদের। গড়পড়তা উচ্চতা চার ফুটের চেয়েও কম। কিছু প্রাপ্তবয়স্করা এর চাইতেও বেঁটে। এরা বড়ো দুর্ধর্ষ, রুক্ষ এবং অশাসনীয়। কিন্তু একবার মন জয় করতে পারলে প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। কথাটা খেয়াল রেখো, ওয়াটসন। এবার শোনো এইটা। স্বাভাবিকভাবেই ওরা কদাকার। মাথাটা প্রকাণ্ড, নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। চোখ ছোটো ছোটো এবং ভীষণাকার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত। হাত আর পা আশ্চর্যরকম ছোটো। অত্যন্ত দুর্দান্ত, অশাসনীয় এবং ভয়ংকর প্রকৃতির দরুন অনেক চেষ্টা করেও ব্রিটিশ শাসক এদের মাথা নোয়াতে পারেনি। জাহাজ ডুবি খালাসিদের কাছে এরা সাংঘাতিক আতঙ্ক। পাথরের গদা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়, নয়তো বিষ মাখানো তির ছুড়ে নিমেষে মেরে ফেলে। তারপর লাশ নিয়ে নরমাংস ভোজ আরম্ভ হয়। চমৎকার অমায়িক লোক বটে, তাই না ওয়াটসন ! এ-লোককে নিজের ওপর ছেড়ে দিলে নিজস্ব পদ্ধতিতে কী বীভৎস কাণ্ড করা যেত ভাবতে পার! আমার তো মনে হয় এমনকী জোনাথন স্মলও তা বরদাস্ত করত না, ওর সাহায্যই নিত না।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ-লোককে সে সঙ্গী জোটাল কী করে?

আরে ভায়া, এর বেশি আর কিছু জানি না আমি। ধরে নাও যেহেতু স্মল নিজেই আন্দামানে ছিল এবং সেখান থেকেই এখানে তার আগমন, সুতরাং বিচিত্র ভয়ংকর এই দ্বীপবাসীটাও তার সঙ্গে এসেছে। সময় এলে এর সম্বন্ধে আরও খবর পাবই, নিশ্চিন্ত থেকো। ওয়াটসন, তোমাকে ভীষণ কাহিল লাগছে। শুয়ে পড়ো সোফায়, দেখি তোমাকে ঘুম পাড়াতে পারি কিনা।

কোণ থেকে বেহালা নিয়ে এল হোমস। আমি লম্বা হলাম সোফায়। অদ্ভুত একটা বাজনা শুরু করল ও। সুরটা নিশ্চয় নিজের, কেননা নতুন নতুন সুর তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওর। স্বপ্নময়, ছন্দোময়, মিষ্টি বাজনা কানের মধ্যে দিয়ে মাথায় পৌঁছে আমাকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে গেল একটু একটু করে। অস্পষ্ট মনে পড়ে দীর্ঘক্ষণ হাত নেড়ে ছড়ি টানছে বন্ধুবর, চোখে-মুখে নিবিড় তন্ময়তা, তারপর মনে হয় যেন শব্দের প্রশান্ত কোমল সাগরে ভেসে যাচ্ছি, পৌঁছেছি স্বপ্নের দেশে এবং নির্নিমেষ আমার পানে চেয়ে আছে মেরি মর্সটানের মিষ্টি মুখখানি।

৯। শৃঙ্খলে যেখানে ফাঁক রয়েছে

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল আমার। শরীর ঝরঝরে। ঘুমানোর সময়ে শার্লক হোমসকে যেভাবে বসে থাকতে দেখেছিলাম, এখনও বসে রয়েছে সেইভাবে। কেবল বেহালা পাশে রেখে চোখ ডুবিয়ে রয়েছে একটা বইতে। আমার নড়াচড়ার শব্দে মুখ তুলে চাইতেই দেখলাম, দুশ্চিন্তার কালো হয়ে উঠেছে মুখখানা।

বলল, খুব ঘুমিয়েছ। এত কথা বললাম, তবুও ঘুম ভাঙেনি।

কিছুই শুনিনি। নতুন খবর পেয়েছ তাহলে?

না। খুবই মুষড়ে পড়েছি, ওয়াটসন। অবাকও হয়েছি। বিকেলের মধ্যে খবরের আশা করেছিলাম। এইমাত্র এসেছিল উইগিন্স। লঞ্চের চিহ্ন নেই কোথাও। অথচ প্রতিটি ঘণ্টা এখন গুরুত্বপূর্ণ।

আমাকে দিয়ে কিছু হয় তো বল। শরীর ঝরঝরে। আর এক রাতের ধকল সইতে পারব।

না। কিছু করার নেই এখন– ঠাঁয় বসে থাকা ছাড়া। বেরোলেই যদি খবর আসে, সে-খবর পেতে দেরি হয়ে যাবে। তোমার মন যা চায় তাই কর, আমাকে বসে থাকতে হবে এখানেই।

আমি তাহলে ক্যাম্বারওয়েলে গিয়ে মিসেস সিসিল ফরেস্টারের খবর নিয়ে আসি। গতকাল সেইরকমই বলেছিলেন।

চোখের মধ্যে হাসি নাচিয়ে হোমস বললে– খবরটা কার নেবে? মিসেস সিসিল ফরেস্টারের?

মিস মর্সটানেরও। জল কদ্দুর গড়াল জানতে চেয়েছিলেন।

আমি হলে বেশি কথা বলতাম না। সেরা মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই– পেটে কথা থাকে না।

মন্তব্যটা অতিশয় খারাপ– আঁতে ঘা লাগে। আমি কিন্তু তর্ক করলাম না, দাঁড়ালামও না। বললাম, ঘণ্টাখানেক কি দুয়েকের মধ্যে ফিরছি।

অলরাইট! গুডলাক। নদীর ওপারেই যদি যাও, তো টোবিকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ওকে আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।

দোআঁশালাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। পিনচিন লেনের বুড়ো প্রকৃতিবিদের হাতে তাকে সঁপে দিলাম, সেইসঙ্গে একটা আধ-গিনি। ক্যাম্বারওয়েলে পৌছে দেখলাম রাতের ধকলে শুকিয়ে গেলেও নতুন খবরের প্রত্যাশার সাগ্রহে পথ চেয়ে বলে মিস মর্সটান। আগ্রহ মিসেস ফরেস্টারেরও কম নয়। যা-যা করেছি সব বললাম– বিয়োগান্তক দৃশ্যের সবচেয়ে বীভৎস অংশগুলো চেপে গেলাম। মি. শোল্টোর মৃত্যুর কথা বললাম বটে, কীভাবে তাকে মারা হয়েছে– তা বললাম না। বাদসাদ দেওয়ার পরেও দেখা গেল আমার কাহিনি তাদের চমৎকৃত এবং বিস্মিত করেছে।

দারুণ রোমান্স দেখছি। সোল্লাসে বললে মিসেস ফরেস্টার।

আহত মহিলা, পাঁচ লাখ পাউন্ডের হিরেমানিক, মিশমিশে নরখাদক, কেঠো পা-অলা দুর্বত্ত। রূপকথায় এদের বদলে থাকে মামুলি ড্রাগন অথবা কুচুটে রাজা।

রাজকন্যের উদ্ধারের জন্যে দু-জন ডানপিটে নাইটও রয়েছেন কিন্তু রোমান্সে, ঝকমকে চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন মিস মর্সটান।

কী যে বল মেরি, তোমার ঐশ্বর্য উদ্ধার নির্ভর করছে তো এই দু-জনেরই তদন্তের ওপর। কিন্তু তোমাকে তো তেমন উত্তেজিত দেখছি না। রাজ ঐশ্বর্য হাতের মুঠোয় এলে পৃথিবীটা যে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, সে-খেয়াল আছে?

এইরকম একটা চিত্ত চঞ্চলকারী সম্ভাবনার কথা শুনেও মিস মর্সটানের চিত্ত বৈকল্য ঘটল না লক্ষ করে মনে মনে একটা গোপন উল্লাস, একটা বিচিত্র

রোমান্স অনুভব করলাম। উল্লসিত হওয়া তো দূরে থাকুক। সামান্য মাথা দুলিয়ে জানিয়ে দিলেন ব্যাপারটা তুচ্ছ এবং তার মোটেই আগ্রহ নেই।

বললেন, আমার চিন্তা কেবল মি. থেডিয়াস শোল্টোকে নিয়ে। উনি অনেক করেছেন আমার জন্যে। গোড়া থেকেই যথেষ্ট মায়া-দয়া দেখিয়েছেন, খাঁটি ভদ্রলোকের মতো আচরণ করেছেন। আমাদের উচিত তাকে এই জঘন্য মিথ্যে অপবাদ থেকে মুক্ত করা।

সন্ধের আগেই বেরোলাম ক্যাম্বারওয়েল থেকে– রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। চেয়ারের পাশে পড়ে আছে বন্ধুর তামাক, পাইপ আর বই– নিজে উধাও। আমার নামে চিঠিপত্র রেখে গেছে কিনা খোঁজ করলাম আশেপাশে, কিন্তু কিছুই পেলাম না।

খড়খড়ি বন্ধ করার জন্যে মিসেস হ্যাডসন ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলাম– মি. শার্লক হোমস কি বেরিয়েছেন?

আজ্ঞে না। নিজের ঘরে রয়েছেন, গলা খাটো করে– ওঁর স্বাস্থ্যের জন্যে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

কেন মিসেস হাডসন?

বড়ো অদ্ভুত লোক। আপনি বেরিয়ে গেলেন, উনিও পায়চারি আরম্ভ করলেন। করেই চললেন। কান পচে গেল পায়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে! তারপর শুনলাম নিজের সঙ্গে বকবক করছেন, বিড়বিড় করছেন। সদর দরজায় যতবার ঘণ্টা বাজছে, দৌড়ে এসে সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন- কে এল, মিসেস হাডসন? কিছুক্ষণ আগে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন- কিন্তু এখনও ঘরের মধ্যে পায়চারি করার আওয়াজ কানে আসছে। শরীর ভেঙে পড়তে পারে, এই ভয়ে মাথা ঠান্ডা করার একটা ওষুধের কথা বলতে গেছিলাম, কিন্তু এমনভাবে তাকালেন যে পালাবার পথ পেলাম না।

বললাম, দুশ্চিন্তা করবেন না! এভাবে আগেও দেখেছি ওঁকে। মাথায় ছোটোখাটো সমস্যা ঢুকলে এইরকম অস্থির হয়ে যান উনি!

কথাটা হালকা করে দিলাম বটে, কিন্তু আমার নিজের মনে তা পাষাণ হয়ে চেপে রইল। উদবেগ আরও বাড়ল যখন সারারাত পাশের ঘরে শুনলাম চাপা ধুপধুপ শব্দ- একনাগাড়ে পায়চারি করছে শার্লক হোমস। বেচারি! নিস্ক্রিয় থাকলেই অবস্থা ওর কাহিল হয়– এত ছটফটানি তো সেইজন্যেই, লড়ে মরছে নিজের মনের সঙ্গে।

সকাল হল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বলল হোমস। মুখ কালো, উদ্রান্ত। গালে জ্বরতপ্ত ফুটফুটে দাগ।

বললাম, নিজেকে মারছ। কাল সারারাত তোমার কুচকাওয়াজের আওয়াজ শুনেছি।

না হে, ঘুমোতে পারিনি একদম। নারকীয় এই বাধাটা কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতর থেকে। এত বড়ো বড়ো বাধা পেরিয়ে আসার পর এই একটা ছোট্ট বাধায় হোঁচট খেয়ে পড়ার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। অসহ্য। লঞ্চের খবর পেয়েছি, লঞ্চে যারা রয়েছে, তাদের খবরও জানা হয়ে গিয়েছে– তা সত্ত্বেও আর কোনো খবর পাচ্ছি না। অন্যান্য ভাবেও খবর আনবার ব্যবস্থা করেছি– আমার সাধ্যমতো সব বন্দোবস্তই হয়েছে। নদীর দু-পাড় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু খবর পাওয়া যায়নি লঞ্চের। মিসেস স্মিথও খবর পাননি স্বামীর! এ থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়– তলা ফুটো করে লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছে হারামজাদারা, কিন্তু আমার আপত্তি আছে এ-সিদ্ধান্তে।

এমনও হতে পারে তো যে মিসেস স্মিথ ইচ্ছে করেই ভুল খবর দিয়ে আমাদের বিপথে চালিয়েছে?

আমার তা বিশ্বাস হয় না। ও-সম্ভাবনা নাকচ করতে পার। খবর নিয়ে জেনেছি সত্যিই ওইরকম দেখতে একটা লঞ্চ আছে!

মোহনার দিকে এগিয়ে উৎসের দিকে যায়নি?

সে-কথাও আমি ভেবেছি। একটা তল্লাশি দল পাঠিয়েছি– রিচমন্ড পর্যন্ত দেখে আসবে। তাতেও যদি লঞ্চের খোঁজ না-পাওয়া যায় তো নিজেই বেরোব– লঞ্চের বদলে লঞ্চের আরোহীদের তল্লাশ করব। তার আগে অবশ্য খবর আসবে– আসতেই হবে।

কিন্তু এল না। উইগিন্সের তরফ থেকেও নয়– অন্যান্য কারো মারফতও নয়। নরউড ট্র্যাজেডি নিয়ে নিবন্ধ বেরিয়েছে সবক-টা পত্রিকাতেই। সব কাগজই এক সুরে বাপান্ত করেছে বেচারি থেডিয়াস শোল্টোর। নতুন খবর কেউ দিতে পারেনি। শুধু জানা গেল পরের দিনই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে করোনারের জুরি নিযুক্ত হবে এবং তদন্ত আরম্ভ হবে। সন্ধের দিকে ক্যাম্বারওয়েল গিয়ে মহিলা দু-জনকে সারাদিনের ব্যর্থতার খবর জানিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে ভীষণ মনমরা হয়ে বসে শার্লক হোমস। আমার প্রশ্ন-টশ্ন শুনেও শুনল না, জবাব যা দিল, তা না-দেওয়ারই শামিল! সমস্ত সন্ধেটা কী এক নিগুঢ় রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত রইল। বিশ্লেষণের শেষে এমন একটা বিটকেল গন্ধ বেরোল ঘর থেকে যে বাড়ি ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে আসতে হল আমাকে। মাঝরাতে শুনলাম টেস্টটিউব ঠোকাঠুকির ঠুনঠুন শব্দ- অর্থাৎ দুর্গন্ধ-কারক এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে এখনও বিভোর আমার বন্ধু।

খুব ভোরেই চোখ খুলে চমকে উঠলাম বিছানার পাশে সেজেগুজে হোমসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। পরনে খালাসিদের মোটা পোশাক– পুরু, খাটো ওভারকোট আর গলা ঘিরে কর্কশ, লাল স্কার্ফ।

বলল, ওয়াটসন, চললাম নদীর দু-পাশে খোঁজ নিতে। সারারাত ভেবেছি এই নিয়ে– এ-ধাঁধা থেকে বেরোনোর একটা পথই মাথায় এসেছে। সম্ভাবনাটা বাজিয়ে দেখতে চাই।

আমিও নিশ্চয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে?

না। আমার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে থাকলেই বরং অনেক বেশি কাজ দেবে। কালরাতে উইগিন্স হতাশ হয়ে পড়লেও আমার হিসেব মতো আজকে খবর আসার নামে আসা সব টেলিগ্রাম আর চিঠি খুলে তুমি পড়ো– তেমন সব খবর পেলে নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে যা করবার, করবে। ভরসা রাখতে পারি তোমার ওপর?

নিশ্চয় রাখতে পারো।

মনে হয় টেলিগ্রাম পাঠাতে পারবে না– কোথায় থাকব নিজেও জানি না– তোমাকেও বলতে পারব না। কপাল ভালো থাকলে বেশিক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে না। ফিরে আসার আগেই একটা-না-একটা খবর পাবই।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম– তখনও কোনো খবর এল না হোমসের দিক থেকে। 'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা খুলে দেখি রহস্যাবৃত কেসটা সম্পর্কে নতুন খবর বেরিয়েছে।

খবরটা এই: আপার নরউড ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত কেসটিকে যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার চাইতে অনেক জটিল অনেক রহস্যময়। নতুন পাওয়া প্রমাণ অনুসারে মি. থোডিয়াস শোল্টোর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডে কোনোক্রমেই জড়িত থাকা সম্ভব নয়। কাল রাতে তাকে এবং হাউসকিপার মিসেস বার্নস্টোনকে হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের মোক্ষম সূত্র নাকি পুলিশের হাতে এসেছে এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ অফিসার অ্যাথেলনি জোন্স তার সুবিখ্যাত প্রাণপ্রাচুর্য এবং বুদ্ধিপ্রাচুর্যসহ এই সূত্র অনুসারে অপরাধী অন্বেষণ করছেন। যেকোনো মুহূর্তে আরও ধরপাকড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

মনে মনে ভাবলাম, মন্দ কী! বন্ধুবর শোল্টো তো বেঁচে গেল। নতুন সূত্রটা অবশ্য কী বুঝতে পারছি না। তবে পুলিশ যখন নাকনিচোবানি খায় আর হরদম ভুল করে, তখন সব ক-টা ভুলই এক ধাঁচে ঢালা হয়।

কাগজটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিতেই হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপনে চোখ পড়ল। বিজ্ঞাপনটাই এই:

হারিয়েছি। গত মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ 'অরোরা' স্টিমলঞ্চে বেরিয়েছে মাঝি মর্ডেকাই স্মিথ এবং তার ছেলে জিম। স্টিমলঞ্চের রং কালো, দু-পাশে লাল পটি। ফানেল কালো, সাদা ব্রেড। জেটিতে মিসেস স্মিথের কাছে অথবা ২২১ বি, স্ট্রিটে মি. স্মিথের এবং অরোরা লঞ্চের খবর পৌছে দিলে নগদ পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।

নিশ্চয় হোমসের কাজ। বেকার স্ট্রিটের ঠিকানাই তার প্রমাণ। বেশ চালাকি করেছে হোমস। পলাতকরা দেখে ভাববে স্বাভাবিক কারণেই উদবিগ্ন হয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী।

সুদীর্ঘ দিনটা যেন আর শেষ হতেই চায় না। দরজায় খটখট টোকা মারার আওয়াজ বা রাস্তায় পায়ের শব্দ শুনলেই ভেবেছি এই বুঝি ফিরে এল হোমস, নয়তো জবাব এল বিজ্ঞাপনের! বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন দিতে পারলাম না। বার বার মন ছুটে গেল পলাতক দুই শয়তান শিরোমণি এবং বিচিত্র তদন্তের দিকে। বন্ধুবরের যুক্তির শৃঙ্খলের গোড়ায় গলদ নেই তো? প্রকাণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছে না তো বেচারি? কল্পনাপ্রিয় চঞ্চল মন দিয়ে ভুল যুক্তির ওপর নড়েচড়ে ইমারত রচনা করে বসেনি তো? অবশ্য ওকে কখনো ভুল করতে দেখিনি। তাহলে বলব অকাট্য যুক্তিবাজকেও মাঝে মাঝে ঠকে যেতে হয়। অতি বিশুদ্ধ ওর যুক্তিপ্রবাহ এবং সেইজন্যেই ভুল করা স্বাভাবিক– আসলে হয়তো তা অনেক সোজা, অনেক মামুলি এবং রয়েছে নাগালের মধ্যেই। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে, সাক্ষীসাবুদ সব আমিও দেখেছি, কোন কোন যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে এসেছে হোমস– তাও শুনেছি স্বকর্ণে। পরের পর অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, অনেক ব্যাপার নেহাত তুচ্ছও মনে হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে অবশ্যম্ভাবী

এক পরিণতির দিকে। কাজেই নিজের মনের সঙ্গে চোখ ঠেরে লাভ নেই- হোমসের ব্যাখ্যা ভুল এমন ধারণা আমার পক্ষেও করা সম্ভব নয় এবং আমি বিশ্বাস করি শার্লক হোমস ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে যে অনুমিতি খাড়া করেছে– তা নির্ভেজাল সত্য এবং অতীব চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর।

বিকেলে তিনটের সময়ে দারুণ জোরে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। ভারিক্কি গলার আওয়াজ শুনলাম হলঘরে এবং সচমকে দেখলাম ঘরে ঢুকছেন স্বয়ং অ্যাথেলনি জোন্স। আপার নরউডে যেমন হম্বিতম্বি এবং সর্দারি দেখেছিলাম– তার লক্ষণ দেখা গেল না এখনকার চেহারায়। উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে অধ্যাপকের মতো কাটছাট ভাষায় জ্ঞান দিয়েছিল যে এখন তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, বিনয়ে যেন মাটি স্পর্শ করছে এবং হাবভাবে ক্ষমা প্রার্থনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।।

গুড-ডে স্যার; গুড-ডে। মি. শার্লক হোমস বেরিয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ। কখন ফিরবে তাও জানি না। অপেক্ষা করতে পারেন। চেয়ার নিয়ে বসুন, এই নিন চুরুট। ।

ধন্যবাদ, আপত্তি নেই। বিরাট লাল রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল জোন্স।

হুইস্কি আর সোডা চলবে?

আধ গেলাস দিন। বড্ড গরম– এ সময়ে এত গরম বাড়ে না। দুশ্চিন্তা আর খাটাখাটনিও বেড়েছে তেমনি। নরউড কেসে আমার থিয়োরি তো আপনি জানেন?

হ্যাঁ, একবার বলেছিলেন বটে।

থিয়োরিটা নতুন করে খাঁড়া করতে বাধ্য হলেন। মি. শোল্টোকে জালে ফেলার পর ফুস করে তলার ফুটাে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এমন একটা অন্যত্রস্থিতি প্রমাণ করে দিলেন যা নাকচ করা গেল না। ভাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইস্তক একজন না একজন তাকে দেখেছে– চোখের

আড়াল হয়নি একবারও। কাজেই ছাদে উঠে ঠেলা দরজা খুলে ফুটো দিয়ে উনি ঘরে ঢোকেননি। কেসটা বড়ো জটিল, আমার সুনাম ক্ষুন্ন হতে বসেছে। তাই সাহায্য পেলে বর্তে যাব।

মাঝে মাঝে সাহায্যের দরকার সবারই হয়। বললাম আমি।

খসখসে গোপন কণ্ঠে বললে জোন্স, আপনার বন্ধু মি. শার্লক হোমস সত্যিই বড়ো আশ্চর্য মানুষ। ওঁকে হারানো যায় না। অনেক কেসে ওঁকে দেখেছি, কিন্তু সুরাহা করতে পারেননি এমন কোনো কেসের খবর আমার জানা নেই। ওঁর কার্যপদ্ধতি উলটোপালটা ধরনের– গতানুগতিক নয়, সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান আচমকা– তা সত্ত্বেও বলব পুলিশের খাতায় নাম লেখালে বড়ো অফিসার হতে পারতেন, কথাটা পাঁচ কান হলেও কিছু এসে যায় না আমার। আজ সকালে আবার একটা টেলিগ্রাম পেলাম ওঁর কাছ থেকে– শোল্টো রহস্যের নতুন সূত্র নাকি পেয়েছেন। এই দেখুন টেলিগ্রাম।

পকেট থেকে তারবার্তা বার করে আমার হাতে দিলেন জোন্স। দুপুর বারোটার সময়ে পপলার ডাকঘর থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম। "এখুনি বেকার স্ট্রিটে যান। আমি না-থাকলে বসে থাকুন, না-ফেরা পর্যন্ত। শোল্টো গুপ্তঘাতকবাহিনীর নাগাল ধরে ফেলেছি। শেষ দৃশ্যে হাজির থাকার ইচ্ছে থাকলে আজ রাতে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।"

বললাম, ভালোই তো। আবার দেখছি নাগাল ধরে ফেলেছে।

তাই বলুন, উনি তাহলে ভুল করেছেন। সহর্ষে বলল জোন্স, খুশি চাপতে পারল না হাবভাবে। যত দুঁদেই হই না কেন, মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় আমাদের সবাইকেই। এটাও তেমনি উড়োখবর হতে পারে। তাহলেও অফিসার হিসেবে আমার কর্তব্য সব সূত্রের শেষ পর্যন্ত দেখা। দরজায় কে এসেছে দেখুন। মি. হোমস ফিরলেন মনে হচ্ছে।

সিঁড়িতে গুরুভার পদশব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে জোরে জোরে সাঁ-সাঁ করে নিশ্বাস ফেলার এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ। পায়ের মালিক যেন একদম হাঁপিয়ে গেছে। দু-একবার দাঁড়িয়েও গেল– পা যেন আর চলছে না– সিঁড়ি ভাঙতে যেন আর পারছে না। তারপর কষ্টেসৃষ্টে এসে পৌঁছল দরজায় এবং ঢুকল ভেতরে। আওয়াজের সঙ্গে মিলে যায় লোকটার চেহারা। বয়স হয়েছে, পরনে সমুদ্রচারী নাবিকের পুরোনো পোশাক। খাটো, পুরু ওভারকোট, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। পিঠ বেঁকিয়ে গেছে, হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছে এবং হাঁপানি রুগির মতো নিশ্বাস নিচ্ছে– যন্ত্রণায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। ওক কাঠের ইয়া মোটা একটা মুগুরের ওপর দিয়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে দু-কাঁধ বেঁকিয়ে বাতাস টানতে লাগল ফুসফুসের মধ্যে। চিবুক ঢাকা রঙিন স্কার্কের ফাঁক দিয়ে মুখ বলতে দেখা গেল শুধু একজোড়া তীক্ষ্ণ কৃষ্ণ চক্ষু, কার্নিশের মতো ঠেলে-বেরিয়ে-আসা নিবিড় সাদা ভুরু এবং সুদীর্ঘ ধূসর গালপাট্টা। সব মিলিয়ে চেহারাটা মর্যাদাসম্পন্ন দক্ষ সমুদ্রচারী নাবিকের– বয়স হয়েছে, অভাবে পড়েছে।

কী চাই? শুধোলাম আমি।

বললে, মি. শার্লক হোমস আছেন?

না, তার তরফে আমি আছি। কিছু খবর দেবার থাকলে আমাকে দিতে পারেন।

তার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।

বললাম তো তার তরফে আমি আছি। কথাটা কী নিয়ে? মর্ডেকাই স্মিথের লঞ্চের ব্যাপারে?

হ্যাঁ। আমি জানি লঞ্চ কোথায়, আমি জানি উনি যাদের খুঁজছেন তারা কোথায়। আমি জানি গুপ্তধন কোথায়। সব জানি আমি।

তাহলে বলুন আমাকে। আমি জানিয়ে দেব মি. হোমসকে। যা বলবার ওকেই বলব, খিটখিটে একগুয়েমির সুরে বললে বৃদ্ধ! খুব বুড়ো হলে সব মানুষ এইভাবে কথা বলে।

তাহলে বসতে হবে ফিরে না-আসা পর্যন্ত।

না, না কাউকে খুশি করার জন্যে পুরো একটা দিন নষ্ট করতে আমি পারব না। মি. হোমস যদি না-থাকেন তো খুঁজেপেতে ওঁকেই সব খবর জেনে নিতে হবে। আপনাদের দু-জনকেই দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না– কোনো কথাও তাই বলব না।

দরজার দিকে টলতে টলতে এগোল বৃদ্ধ– তার আগেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাথেলনি জোন্স।

দাঁড়ান, যে-খবর আপনি এনেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আপনার ইচ্ছে না থাকলেও আটকে রাখব মি. হোমস ফিরে না-আসা পর্যন্ত।

দরজার দিকে গেল বৃদ্ধ– কিন্তু পাল্লায় পিঠ দিয়ে জোন্সকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল বৃথা চেষ্টা।

মুগুরের মতো লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে চিৎকার করে– এ কী নোংরা ব্যাপার। আমি এসেছি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। জীবনে দেখিনি আপনাদের, কেন এভাবে আটকে রাখছেন আমাকে!

আপনার সময় যা নষ্ট হবে, তা উশুলও হয়ে যাবে, বললাম আমি। আসুন, এই সোফায় বসুন। বেশি দেরি হবে না।

সোফায় বসল বৃদ্ধ– দু-হাতে ন্যস্ত রইল গোমড়া মুখখানা। চুরুট খেতে খেতে ফের কথা শুরু করলাম আমি আর জোন্স। আচমকা কানের কাছে শোনা গেল হোমসের গলা।

আমাকেও একটা চুরুট দিলে পারতে। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম দু-জনেই। সত্যিই প্রশান্ত সকৌতুক মুখে পাশে দাঁড়িয়ে হোমস।

‘হোমস!’ বললাম সবিস্ময়ে, ‘তুমি! কিন্তু বুড়োটা গেল কোথায়?

এই তো সেই বুড়ো, স্তূপীকৃত সাদা চুল দেখিয়ে বললে হোমস। এই দেখ সে- গালপাট্টা, পরচুলা, ভুরু- সব। ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে জানতাম, কিন্তু এত ভালো হয়েছে বুঝিনি- অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করে গেলাম।

ভারি পাজি লোক তো আপনি। ভীষণ খুশি হয়ে সোল্লাসে বললে জোন্স। পাক্কা অভিনেতা হতে পারতেন মশায়- কালেভদ্রে এমন নট জন্মায়। কাশিখানা অবিকল মেহনতি কাশি, ঠকঠক করে শুধু পা কাঁপানোর পুরস্কারই পেতেন হপ্তায় দশ পাউন্ড। তবে যাই বলুন না কেন, খটকা লেগেছিল আপনার চকচকে চোখ দেখে। বেরোতে তো দিইনি ঘর থেকে। কেমন?

চুরুট ধরিয়ে হোমস বললে, সারাদিন এই ধড়াচুড়ো নিয়েই কাজ করছি। অপরাধী মহলের অনেক রথী মহারথী আজকাল আমার মুখ দেখেই চিনে ফেলে- বিশেষ করে এই বন্ধুটি আমার কিছু কীর্তিকাহিনি নিয়ে গল্প ছাপবার পর থেকেই ঘটেছে এই কাণ্ড। তাই ওদের মহলে যখন যাই যুদ্ধজয়ের অভিলাশ নিয়ে, একটু ভোল পালটানোর দরকার হয়। টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?

পেয়েই তো এসেছি। আপনার কেস কদ্দুর?

অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। দু-জন কয়েদিকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, বাকি দু-জনের বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না।

মন খারাপ করবেন না। যে দু-জন গেছে, তার বদলি অন্য দু-জন পাবেন। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে। পুলিশ অফিসার হিসেবে সব কৃতিত্ব আপনিই পাবেন- কিন্তু আমার হুকুম মেনে চলতে হবে। রাজি?

পাকড়াও যদি করে দিতে পারেন শয়তানদের, যা বলবেন তাই শুনব।

বেশ, বেশ। প্রথমেই দরকার খুব জোরে ছুটতে পারে এমন একটা পুলিশবোট- স্টিম লঞ্চ- ঠিক সাতটার সময়ে হাজির থাকবে ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেয়ারেণ্ড।

ও আর এমন কথা কী। চব্বিশ ঘণ্টাই ওখানে একটা লঞ্চ মোতায়েন থাকে। তাহলে টেলিফোনে পাকা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

তারপরই চাই গাটাগোট্টা দু-জন লোক– মারপিট যদি হয়?

ও-রকম লোক জনা দু-তিন বোটেই থাকে। আর?

আসামিদের পাকড়াও করলেই গুপ্তধন আসবে। আমার বিশ্বাস, অর্ধেক হারে মালিকের ওপর যার স্বত্ব, সেই ভদ্রমহিলাটির হাতে রত্নপেটিকা স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলে আমার এই বন্ধুটি যৎপরোনাস্তি খুশি হবে। যার জিনিস তিনিই খুলবেন হিরের বাক্স। ঠিক কিনা, ওয়াটসন?

মাথা নেড়ে জোন্স বললে, খুবই উলটোপালটা ব্যাপার। অবশ্য সবই যখন দেখছি উলটোপালটা তখন না হয় এটাকেও চোখ ঠেরে ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, গুপ্তধন প্রথমে সরকারের হাতে যাবে। তদন্ত শেষ হলে যাবে মালিকের হাতে।

অবশ্য, অবশ্য। তাও ম্যানেজ করা যাবে। আর একটা পয়েন্ট। জোনাথন স্মলের মুখ থেকে আমি এ-ব্যাপারে দু-একটা খুঁটিনাটি জেনে নিতে চাই। আপনি তো জানেন খুঁটিনাটির ওপরেই জোর দিই আমি। পুলিশি জবানবন্দি নিন গে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার এই ঘরে বা অন্যত্র আমাকে সুযোগ দিতে হবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার। আপনার লোক অবশ্য পাহারায় থাকবে– যাতে না-পালায়। রাজি?

আরে মশাই, আপনি এখন গুরু– পুতুল নাচানোর সব সুতো একাই ধরে বসে আছেন। কে এই জোনাথন স্মল তাই জানি না– এ-রকম নামে কোনো লোক আছে এমন প্রমাণ এখনও পাইনি। সে-লোককে যদি আপনি পাকড়াও করেন, নিন না তার ইন্টারভিউ, আমার আপত্তি নেই।

পাকা কথা। আর কিছু?

শুধু একটা ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হবে আপনাদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে! ঝিনুক আর মেঠো মোরগের সঙ্গে সাদা মদ। ওয়াটসন, তুমি কিন্তু ভায়া গেরস্থালির কাজে আমার প্রতিভার কদর করনি কখনো।

১০। দ্বীপবাসীর শেষদিন

বেশ ফুর্তির মধ্যে শেষ হল খাওয়াদাওয়া। ইচ্ছে করলে অনর্গল কথা বলতে পারে হোমস। সেদিন দেখলাম ওর সেই ইচ্ছেই রয়েছে। মনে হল একটা স্নায়বিক উল্লাসের মধ্যে রয়েছে বন্ধুবর। এ-রকম উল্লসিতভাবে কখনো ওকে দেখেনি। যেন ঝলমল করছে, চলনে বলনে ঝিকিমিকি দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে। নানা বিষয়ে পরের পর কথা বলে চলল একই রকমারি বিষয়। কিন্তু প্রতিটিতে যেন বিশেষভাবে কৃতবিদ্য। বাইবেলের ঘটনা অবলম্বনে মধ্যযুগের অভিনয়, পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত মৃন্ময় পাত্র, স্ট্রাডিফেরিয়াস বেহালা, সিংহলের বৌদ্ধধর্ম এবং ভবিষ্যতের উপাসনাপদ্ধতি– সবই যেন তার অধীত বিদ্যা। ক-দিন বিষণ্ণতার অন্ধকার কেটেছে– আর এখন ফুর্তিতে কলকলিয়ে উঠেছে। দেখা গেল ডিউটির বাইরে আড্ডার আসর মত করে দেওয়ার ক্ষমতা অ্যাথেলনি জোন্স রাখে। খানা খেল তারিয়ে তারিয়ে– সম্মানীয় অতিথির মতোই। হাতের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, এই কল্পনায় ফুর্তি জেগেছিল আমার প্রাণেও– হোমসের মতোই। তিনজনের কেউই অবশ্য খাওয়ার সময়ে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

টেবিলের কাপড় পরিষ্কার করার পর ঘড়ি দেখল হোমস– তিনটে গেলাসে কানায় কানায় ঢালল পোর্ট মদ।

বলল, ছোট্ট এই অভিযান যেন সফল হয়। চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক। ওয়াটসন, তোমার পিস্তল আছে তো?

পুরোনো মিলিটারি রিভলবারটা আছে ডেস্কে।

বার করে নাও। প্রস্তুত থাকা ভালো! গাড়ি এসে গেছে দেখছি। ঠিক সাড়ে ছ-টায় বলেছিলাম আসতে।

সাতটা বেজে কয়েক মিনিটের সময়ে পৌছোলাম ওয়েস্টমিনিস্টার জেটিতে। লঞ্চ ভাসছে জলে। আগাপাশতলা সূচীতীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিল হোমস।

পুলিশবোট বলে মনে হতে পারে এমনি কোনো চিহ্ন আছে?

আছে; পাশের ওই সবুজ লণ্ঠনটা।

তাহলে নামান লণ্ঠন।

সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল সবুজ লণ্ঠন। ডেকে উঠতেই দড়ি খুলে দেওয়া হল জেটি থেকে। আমি, জোন্স আর হোমস বসলাম পেছনে। হাল ধরে রইল একজন লোক। একজন সামলাতে লাগল ইঞ্জিন, দু-জন কাঠখোট্টা পুলিশ ইনস্পেকটর রইল সামনে।

টাওয়ারের দিকে। জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডের উলটোদিকে থামতে বলুন।

লঞ্চটা বাস্তবিকই অত্যন্ত দ্রুতগামী। সটাসট পেছিয়ে পড়ল মাল বোঝাই গাধাবোটগুলো– যেন নট নড়নচড়ন নট কিছু হয়ে ভাসছে জলে। একটা রিভার স্টিমারকে নক্ষত্রবেগে ওভারটেক করে আসার পর হৃষ্ট হাসি ফুটল হোমসের ঠোঁটে।

বলল, নদীর বুকে যেকোনো নৌকারই নাগাল ধরতে পারব বলে মনে হচ্ছে।

সবাইকে টেক্কা মারতে না-পারলেও এ-লঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো লঞ্চ এ-তল্লাটে খুব কম আছে।

অরোরার নাগাল ধরতেই হবে। লঞ্চটার সুনাম আছে– সাংঘাতিক জোরে ছোটে। ওয়াটসন, মনে পড়ে বড়ো বাধা পেরিয়ে আসার পর ছোট্ট বাঁধায় হোঁচট খাওয়ায় কীরকম তিরিক্ষে হয়ে উঠেছিলাম?

নিশ্চয় পড়ে।

তখন কী করলাম তুমি দেখেছ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মন ডুবিয়ে দিলাম, মানে মনটাকে জিরেন দিলাম। এ দেশের বিখ্যাত একজন কূটনীতিবিদ একবার বলেছিলেন, কাজ পালটানোই হল সেরা বিশ্রাম, এটাও তাই। হাইড্রোকার্বন দ্রবণীয় কিনা এই পরীক্ষায় তন্ময় হওয়ার পর হাইড্রোকার্বন যেই গুলে গেল–

ফিরে এলাম শোল্টো রহস্যে। গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে বসলাম পুরো ব্যাপারটা। নদীর এদিক-ওদিকই খুঁজেছে আমার চরেরা– পায়নি কিছু। কোনো জেটিতেই দাঁড়িয়ে নেই অরোরা লঞ্চ- ফিরেও আসেনি নিজের জেটিতে। সূত্র মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে আমন একখানা লঞ্চকে তলা ফাঁসিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, সব সম্ভাবনার ভরাডুবি হলে এ-ছাড়া তার সম্ভাবনাও অবশ্য থাকে না। জোনাথন স্মল লোকটা হীন ধড়িবাজিতে চৌকস জানি, কিন্তু উঁচুদরের সূক্ষ্ম কৌশলেও যে পোক্ত হতে পারে তা কল্পনা করিনি। এ-জিনিস উচ্চশিক্ষা না-থাকলে আসে না। ভেবে দেখলাম লন্ডনে সে বেশ কিছুদিন ছিল, ছিল বলেই পণ্ডিচেরি লজের খবর নিয়মিত জোগাড় করত। সুতরাং লন্ডন থেকে তার তল্পিতল্পা গুটোতে হলে কিছু সময় চাই- রাতারাতি অত ব্যবস্থা হয় না। আর কিছু না-হলে দাঁড়িপাল্লায় সব সম্ভাবনা ওজন করলে, পাল্লা ঝুঁকবে কিন্তু এই দিকেই।

আমি বললাম, সম্ভাবনাটা কমজোরি। আমার তো মনে হয়– গুপ্তধন উদ্ধারের অভিযানে বেরোনোর আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

আমার তা মনে হয় না। লন্ডনের এই গোপন বিবরটি তার কাছে অমূল্য। এ-ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার মতো অনুকুল অবস্থা আসার আগেই ঘাঁটি ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানোর মতো হঠকারিতা সে দেখাবে না। তবে আর একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে খটকা লাগে। জোনাথন স্মল নিশ্চয় বুঝেছিল মর্কট সঙ্গীটিকে যতই ওভারকেট দিয়ে মুড়ে রাখুক না কেন, অদ্ভুত ওই চেহারা দেখলেই কানাঘুসো আরম্ভ হবে– এমনকী নরউড হত্যার মামলার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এটুকু আঁচ করবার বুদ্ধি তার ঘটে আছে। ঘাঁটি থেকে বেরিয়েছিল অন্ধকারে গা ঢেকে– ঘাঁটিতে ফিরে আসার মতলবও ছিল নিশ্চয় ভোরের আলো ফোটবার আগে। মিসেস স্মিথের কথা অনুযায়ী ওরা লঞ্চ ছেড়েছে তিনটের একটু পরেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আলো উঠে যাওয়ার কথা– লোকজনও বেরিয়ে পড়ল

নদীতে। সুতরাং মনে মনে হিসাবে করে দেখলাম বেশিদূর ওরা যায়নি– যেতে পারে না। টাকার জোরে স্মিথের মুখ বন্ধ করে শেষ চম্পট না-দেওয়া পর্যন্ত ভাড়া করে রেখেছে তার লঞ্চ এবং রত্নপেটিকা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে গোপন ঘাটিতে। দিন দুয়েক লুকিয়ে থেকে দেখবে খবরের কাগজে কী লেখালেখি হচ্ছে এবং আদৌ পুলিশ তাদের সন্দেহ করতে পেরেছে কিনা। তারপর সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে ব্রেভস-এন্ড বা ডাউন্সে গিয়ে কোনো জাহাজে ধরবে– সে-রকম ব্যবস্থাও নিশ্চয় হয়ে আছে আগে থেকে– সোজা যাবে আমেরিকা বা কলোনিতে।

কিন্তু লঞ্চটা থাকবে কোথায়? ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়।

তা ঠিক। মনে মনে তর্ক করে দেখলাম, লঞ্চ যতই অদৃশ্য থাকুক না কেন– নিজেকে জোনাথন স্মল রূপে কল্পনা করলাম। ওই বুদ্ধি নিয়ে কী করতাম মনে মনে ভাবলাম। পুলিশ যদি পেছন নিয়ে থাকে, জেটিতে লঞ্চ দাঁড় করিয়ে রাখলে বা ঘাটে লঞ্চ ফিরিয়ে দিলে পুলিশের পক্ষে তার নাগাল ধরে ফেলা অনেক সহজ হবে। লঞ্চ তাহলে লুকোনো যায় কী করে? অথচ দরকার পড়লেই লঞ্চ পাওয়া যায় কীভাবে? আমি হলে কী করতাম? ভাবতে ভাবতে দেখলাম, পথ একটাই। নৌকো যারা বানায় বা সারায়, মেরামতের অছিলায় লঞ্চখানা তাদের জিম্মায় সঁপে দেওয়া। লঞ্চ তখন চালান হয়ে যাবে মেরামতি শেড বা ইয়ার্ডে, থাকবে চোখের আড়ালে– কিন্তু চাওয়ামাত্র পাওয়া যাবে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে।

সোজা ব্যাপার।

এই ধরনের সোজা ব্যাপারগুলোই সবচেয়ে বেশি চোখ এড়ায়। যাই হোক, ঠিক করলাম ব্যাপারটা বাজিয়ে দেখব। সঙ্গেসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম নিরীহ নাবিকের এই ছদ্মবেশে, খোঁজ নিলাম নদীর দু-পারের সবক-টা নৌকো কারখানায়। খালি হাতে ফিরলাম পনেরোটা ইয়ার্ড থেকে। কিন্তু ষোলো নম্বর ইয়ার্ডে মানে জ্যাকবসনের ইয়ার্ডে ঢুকে খবর পেলাম কেঠো পা-অলা একটা

লোক দু-দিন আগে সামান্য মেরামতির জন্যে অরোরা লঞ্চকে রেখে গেছে এখানে। ফোরম্যান বললে– হাল মেরামত করতে বলেছে বটে, কিন্তু তেমন কোনো গোলমাল নেই হালে। ওই তো রয়েছে অরোরা, লাল পটি দু-পাশে। ঠিক সেই মুহুর্তে কে এল জান? মর্ডেকাই স্মিথ– যাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আমার চরেরা। মদে চুর-চুর অবস্থা। আমি চিনতাম না স্মিথকে। কিন্তু নিজে থেকেই বাজখাই গলায় নিজের নাম আর লঞ্চের নাম জাহির করে বললে, আজকেই রাত ঠিক আটটার সময় লঞ্চ চাই। সময়টা খেয়াল থাকে যেন– রাত আটটা। তারপর এক মিনিটও দেরি সইবে না ভদ্রলোক দু-জনের। স্মিথকে যে টাকায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, তা ওর শিলিং ছড়ানো দেখেই বুঝলাম। টাকা ঝন ঝন করছে পকেটে, একে ওকে হাতে গুজে দিচ্ছে খুচরো। পেছন পেছন গেলাম কিছুদূর, শুড়িখানায় ঢুকল স্মিথ। ফিরে এলাম ইয়ার্ডে। আবার এক ছোকরা চরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম লঞ্চের ওপর নজর রাখার জন্যে। লঞ্চ স্টার্ট দিলেই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে বলে এসেছি। আমরা নদীর মাঝামাঝি থাকব। এর পরেই যদি রত্নপেটিকা সমেত দুশমন গ্রেপ্তার করতে না-পারি তো অবাক হতে হবে বই কী।

জোন্স বললে, ঠিক লোকের পেছনে চলেছেন কিনা তা জানি না– তবে ব্যবস্থাটা করেছেন ভালো। কিন্তু আমি যদি ব্যবস্থার মালিক হতাম জ্যাকবসনের কারখানায় পুলিশবাহিনী ঢুকিয়ে রাখতাম, হারামজাদারা এলেই গ্রেপ্তার করতাম।

এবং সেটা কখনোই সম্ভব হত না। অসম্ভব ধড়িবাজ এই স্মল লোকটা। আগেভাগে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিত পথ পরিষ্কার কিনা। সন্দেহ জাগলেই ঘাপটি মেরে থাকত ঘাঁটিতে আরও এক সপ্তাহ।

আমি বললাম, কিন্তু মর্ডেকাই স্মিথের পেছন পেছন গিয়ে ওদের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা দেখে আসা উচিত ছিল তোমার।

তাতে নষ্টই হত সারাদিনটা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রহস্যময় দুই যাত্রীর গোপন ঘাঁটির ঠিকানা মর্ডেকাই স্মিথও জানে না। মদ আর টাকা পেলেই খুশি- এত প্রশ্ন করতেই-বা যাবে কেন? কখন কী করতে হবে, স্মিথের কাছে সে-খবর পাঠিয়ে দেয় দুশমন– বাস, তার বেশি নয়। না হে, সবদিক ভেবেই বলছি, এটাই সেরা উপায়।

কথা বলতে বলতে একটার পর একটা সেতু পেরিয়ে এসেছি উল্কাবেগে– সুদীর্ঘ সেতুমালা এখন পেছনে। শহর যখন ছাড়িয়ে এলাম, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ল সেন্ট পলসের চুড়োয়। টাওয়ারে পৌঁছোলাম গোধূলি লগ্নে।

সারির দিকে অনেকগুলো আকাশমুখো খোঁচা-খোঁচা মাস্তুল আর দড়িদড়ার দিকে আঙুল তুলে হোমস বললে, ওই হল জ্যাকবসনের কারখানা। জাহাজের মাল বোঝাই আর খালাস করার এই যে নৌকাগুলো সারি সারি ভাসছে, এদের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আগুপাছু করা যাক কিছুক্ষণ। পকেট থেকে রাত্রে দেখবার দুরবিন বার করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তীরের দিকে। বলল, "আমার ছোকরা পাহারাদার রয়েছে বটে, কিন্তু রুমাল তো নাড়ছে না।

সাগ্রহ কণ্ঠে জোন্স বলল, এক কাজ করলে হয় না? চলুন না স্রোতের দিকে আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকি ব্যাটাদের জন্যে? এলেই ধরব।

জবাবে হোমস বললে,'কোনো কিছু যে হবেই, এমনটি ধরে নিয়ে কাজ করা উচিত নয়। স্রোতের দিকেই যে ওরা যাবে, তার সম্ভাবনা পনেরো আনা জানি। কিন্তু তা নাও হতে পারে। এত নিশ্চিত্ত হওয়া ভালো নয়। এখান থেকে ইয়ার্ডে ঢোকবার আর ইয়ার্ড থেকে বেরোবার পথ দেখা যায়– কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। রাতটাও পরিষ্কার– আলোও যথেষ্ট। কাজেই এখান থেকে যাব না। ওই দেখুন গ্যাসলাইটের তলায় লোক জড়ো হচ্ছে কাতারে কাতারে।

ইয়ার্ডের কাজ শেষ করে বেরুচ্ছে।

বদমায়েশের দল! যেমন নোংরা চেহারা, তেমনি নোংরা ভেতরটা। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি ওদের প্রত্যেকের ভেতরে কোথাও না কোথাও একটা নীতিহীন স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে। সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে– সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দেবে। আশ্চর্য হেঁয়ালি এই মানুষ জাতটা। আমি বললাম, কে যেন বলছে মানুষ মানে জানোয়ারের মধ্যে লুকোনো একটা আত্মা। হোমস বললে, এ-ব্যাপারে সবচেয়ে সাচ্চা কথা বলছেন উইনউড রিড। ওঁর কথায়, ব্যষ্টি হিসেবে মানুষ হেঁয়ালি, কিন্তু সমষ্টি হিসেবে মানুষ একটা গাণিতিক নিশ্চয়তা। অমুক ব্যক্তি কী করতে পারেন তা বলতে পারলেও সমষ্টির হিসেবে মানে গড়পড়তা হিসেবে কী হতে পারে তা তুমি সঠিকভাবে অনায়াসে বলতে পার। পৃথক পৃথক ভাবে এক-একটি মানুষ আলাদা, কিন্তু শতকরা হিসেবে মানুষ অপরিবর্তনীয়– একটা যুবক। মতামতটা পরিসংখ্যানবিদদের।

রুমাল উড়ছে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো সাদা মতো কী একটা পতপত করছে অনেক দূরে।

সোল্লাসে বললাম, ‘তোমার ছোকরা সেন্ট্রি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তা আমি দেখতে পাচ্ছি অরোরাকে, হৃষ্ট কণ্ঠ হোমসের। ‘উল্কার মতো ছুটছে। ইঞ্জিনে লাগাও ফুল স্পিড হলদে আলোজ্বালা স্টিমলঞ্চের পেছনে চলো। কী সর্বনাশ! এ যে দেখছি সাংঘাতিক স্পিডে ছুটছে! কলা না দেখায় আমাদের।

কাটিয়ে যখন দৃশ্যমান হয়েছে, ততক্ষণে স্পিড তুলে ফেলেছে অনেকটা। ভয়ংকর গতিবেগে স্রোতের অনুকূলে তীর ঘেঁষে ছুটে চলেছে জল তোলপাড় করে। মুখ কালো হয়ে গেল জোন্সের।

মাথা নেড়ে বললে, সাংঘাতিক জোরে ছুটছে তো! নাগাল ধরতে পারব বলে তো মনে হয় না।

দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠল হোমস, ধরতেই হবে। স্টোকার, ঢালো কয়লা আরও। পুরো দমে ছোটাও লঞ্চ। আগুন ধরে গেলেও পোড়া লঞ্চ নিয়ে পৌছানো চাই হলদে আলোর পাশে।

স্পিড এর মধ্যে উঠে গিয়েছে। সোঁ-সোঁ শব্দে আগুনের গজরানি শোনা যাচ্ছে চুল্লিতে, বিশালাকায় ধাতব হৃৎপিণ্ডের মতো ঝনঝন কড়াং কড়াং, ঘড়াং, শব্দে বিপুল বেগে চলেছে শক্তিশালী ইঞ্জিন। নদীর প্রশান্ত জল কেটে দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছে ধারালো, খাড়াই অগ্রভাগের সামনে এবং চাকার মতো গড়াতে গড়াতে উত্তাল তরঙ্গ ধেয়ে যাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। জীবন্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মতো ইঞ্জিনের প্রতিটি হৃদঘাত নাচিয়ে কাঁপিয়ে ছাড়ছে আমাদের। গলুইয়ে ঝোলানো প্রকাণ্ড হলুদ লণ্ঠনের সুদীর্ঘ আলো থরথরিয়ে কাঁপছে সামনের জলে। ডান দিকে জলের ওপর আবছা মতো বস্তুটাই অরোরা। পেছনে সফেন জলরাশি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কী প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে চলেছে স্টিমলঞ্চ। সওদাগরি জাহাজ, গাধাবোট, স্টিমার পেরিয়ে এলাম নক্ষত্র বেগে– কখনো পাশ দিয়ে, কখনো ফাঁক দিয়ে, কখনো একেবেঁকে সংঘর্ষ বাঁচিয়ে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এল উচ্চকণ্ঠের বিস্মিত নিনাদ- আমরা কিন্তু থামলাম না, থামল না অরোরাও, ভীমবেগে বজ্রনাদে জল তোলপাড় করে উড়ে চলল সমানে– আমরা পেছনে।

‘চাপাও কয়লা, আরও চাপাও। আরও! আরও! ইঞ্জিনরুমের দিকে তারস্বরে চেঁচিয়েই চলল হোমস– উৎকণ্ঠিত শানিত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে রইল প্রজ্জ্বলিত ভয়ংকর আভায়। বাড়াও স্টিম– যতটা সম্ভব– তোলো স্টিম।

অরোরার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জোন্স বললে, একটু এগিয়েছি মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগিয়েছি, এগিয়েছি খানিকটা। নাগাল ধরে ফেলব মিনিট কয়েকের মধ্যেই।

ঠিক এই সময়ে কপাল পুড়ল আমাদের। একটা গাধাবোট তিনটে মালবোঝাই বজরা টেনে নিয়ে এসে গেল আমাদের সামনে– অরোরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই। স্রেফ গায়ের জোরে হাল ঘুরিয়ে দিয়ে কোনোমতে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁচানো গেল বটে, কিন্তু গোল হয়ে পাশ কাটিয়ে ওপাশে বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল দুশো গজ এগিয়ে গিয়েছে অরোরা। এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লঞ্চের চেহারা– তবে একটু একটু করে ঘোর অস্পষ্ট গোধূলি মিশে যাচ্ছে রাতের আঁধারের কবলে। নক্ষত্রখচিত কালো রাত স্পষ্ট হয়ে উঠছে মিনিটে মিনিটে। শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে বয়লারগুলো– পাতলা পলকা খোল কাঁপিছে থরথর করে, প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে যাওয়ার পথে ক্যাচ ক্যাচ আর্তনাদ উঠছে প্রতিটি সন্ধিস্থল থেকে– এত গতিবেগ, এত উন্মাদনা যেন সইতে পারছে না জড়বস্তুটা। পুল- পেরিয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডক পাশ কাটিয়ে, সুদীর্ঘ ডেডফোর্ড রীচ বরাবর নক্ষত্রবেগে গিয়ে আইল অফ ডগস পাক দিয়ে ফের ছুটছি স্রোতের অনুকূলে। সামনের সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বস্তুটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে– ছিমছাম অরোরাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সার্চলাইট ঘুরিয়ে সামনের লঞ্চের ওপর ফেলল জোন্স– ডেকের মূর্তিগুলিকে দেখা গেল স্পষ্ট। লঞ্চের পেছনে উবু হয়ে বসে একটা লোক, দু-হাঁটুর মাঝে কালো মতো একটা জিনিসের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুরের মতো কালো-মতো কী যেন একটা পড়ে রয়েছে পাশে। হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা, চুল্লির গনগনে লাল আভায় দেখা যাচ্ছে বুড়ো স্মিথকে– উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন– প্রাণের দায়ে বেলচা ভরতি কয়লা ঠাসছে ফার্নেসে। প্রথম প্রথম যদিও-বা একটু সন্দেহ ছিল আমরা আদৌ পিছু নিয়েছি কিনা, এখন আর তা নেই। যে-পথ দিয়ে অরোরা গিয়েছে, ঠিক সেই পথ দিয়ে আমরা এসেছি। প্রতিটি মোড়, কোণ, বাঁধা, ঝড়ের মতো ক্ষিপ্ত বেগে পেরিয়ে এসেছি। সুতরাং সন্দেহ আর নেই। গ্রিনউইচে পেরিয়ে গেলাম তিনশো গজ। ব্ল্যাকওয়েলে আড়াইশো। আমার বিচিত্র কর্মজীবনে বহুদেশের বহু প্রাণীকে তাড়া

করেছি, কিন্তু টেমস নদীর বুকে দুরন্ত উন্মত্ত এই মনুষ্য মৃগয়ার মতো বন্য রোমাঞ্চ কখনো রক্তে এমন নাচন জাগায়নি। শনৈঃ শনৈঃ নাগাল ধরে ফেলেছি, একটু একটু করে কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, মিনিটে মিনিটে ব্যবধান কমে আসছে। রাত নিস্তব্ধ, অরোরার যন্ত্রপাতির হাঁপানি আর ঝলসানি আমাদের লঞ্চ থেকে শোনা যাচ্ছে। পেছনের লোকটা এখনও উবু হয়ে বসে আছে, ডেকে হাতদুটো কেবল নড়ছে, কী যেন করছে দু-হাতে এবং মুহুর্মুহু চোখ তুলে দেখছে দুই লঞ্চের মধ্যেকার ব্যবধান আর কতখানি। ক্রমশই এগিয়ে আসছি কাছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে থামতে বলল জোন্স! দুটো লঞ্চের মধ্যে তখন চারটে লঞ্চের সমান ব্যবধান এবং দুটো লঞ্চই জল ছুয়ে যেন উড়ে যাচ্ছে ভয়ংকর গতিবেগে। নদীবক্ষ এখন পরিষ্কার। একদিকে বার্কিং লেভেল, আর একদিকে বিষণ্ণ প্লামস্টীড মার্সেস! জোন্সের গলাবাজি শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পেছনে উবু-হয়ে-বসে-থাকা লোকটা, মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে বিকট ভাঙা গলায় মুণ্ডপাত করতে লাগল আমাদের। লোকটার চেহারা ভালো, শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর দরুন স্পষ্ট দেখা গেল ডান পায়ের উরুর তলা থেকে, পায়ের বদলে রয়েছে একটা কাঠের ঠেকা! বিকট, বীভৎস, ক্রুদ্ধ হুংকার শুনেই পাশে-পড়ে-থাকা জড়বৎ কালো পিণ্ডটা নড়ে উঠল– সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল একটা খুদে লোক– জীবনে এত বেঁটে মানুষ আমি দেখিনি– মাথাটা প্রকাণ্ড এবং বেঢপ আকারের, কালোচুলের বিপুল জটায় তা আরও ভয়ংকর। হোমস রিভলবার বার করে ফেলেছে এর মধ্যেই। বর্বর, বীভৎস, বিকৃত প্রাণীটাকে দেখে আমিও তড়িঘড়ি বার করলাম আমার রিভলবার। কালো মতো অলস্টার বা কম্বলে আবৃত থাকার দরুন শুধু মুখ দেখা যাচ্ছে প্রাণীটার এবং সে-মুখ এমনই করাল-কুটিল যে একবার দেখলেই ঘুম উড়ে যায় চোখের পাতা থেকে। মানুষের মুখে নিষ্ঠুরতা আর পাশবিকতা যে এভাবে ফুটে উঠতে পারে জানা ছিল না আমার। ছোট্ট দু-চোখ জ্বলছে ঘোর আলোয়– নরকের স্ফুলিঙ্গ বুঝি একেই

বলে— জিঘাংসা-সংকীর্ণ দংষ্ট্রার ওপর থেকে গুটিয়ে সরে গেছে মোটা ঠোট এবং খটখট শব্দে দাতের মাড়ি বাজিয়ে অর্ধেক-নর অর্ধেক-শ্বাপদের মতো দাঁত খিচোচ্ছে আমাদের পানে চেয়ে।

শান্ত গলায় হোমস বললে, ওয়াটসন, ওর হাতের দিকে নজর রাখ- তুললেই গুলি করবে।

দুটো লঞ্চের মধ্যে তখন ব্যবধান মাত্র একটা লঞ্চের— শিকার প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছি বললেই চলে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই মূর্তি; দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সাদা চামড়ার লোকটা গালাগাল দিয়ে পিণ্ডি চটকাচ্ছে আমাদের; পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে দাঁত খিচোচ্ছে তার নারকীয় বামন সঙ্গী লণ্ঠনের হলুদ আলোয় ঝকঝক করছে বড়ো বড়ো বিকট দাঁত! কদাকার মুখে ফুটে উঠেছে বর্ণনাতীত শয়তানি!

এত কাছ থেকে এত স্পষ্টভাবে মূর্তিমান সেই আতঙ্ককে দেখতে পেয়েছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম সে-যাত্রা। আমাদের চোখের ওপরেই কম্বল বা অলস্টারের তলা থেকে ফস করে সে টেনে বার করল স্কুল-রুলের মতো একটা খাটো গোলাকার কাঠের টুকরো এবং চেপে ধরল পুরু ঠোটের ওপর। যুগপৎ গর্জে উঠল আমাদের পিস্তল দুটো। বোঁ করে ঘুরে গিয়ে দু-হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে দম আটকানো কাশির মতো খকখকিয়ে ভয়ংকর প্রাণীটা ঠিকরে গেল নদীবক্ষে। পাশ হয়ে পড়েছিল বলেই মুখখানা দেখতে পেয়েছিলাম পলকের মধ্যে। দেখেছিলাম ঘুরন্ত সাদা জলের মাঝে বিকট বিষ মাখানো বুক-কাঁপানো নিস্পলক চাহনি নিবদ্ধ রেখেছে সে আমাদের ওপর। ঠিক সেই মুহুর্তে একঠেঙে লোকটা বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে পড়ল হালের চাকার ওপর এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে দিতেই আচমকা যেন গোৎ খেয়ে দক্ষিণ তীরের দিকে সাৎ করে ঘুরে গেল অরোরা। পেছনের গলুইতে আমাদের লক্ষ্য আছড়ে পড়তে পড়তে পাশ কাটিয়ে বায়ুবেগে বেরিয়ে গেল মাত্র কয়েক ফুট তফাত দিয়ে। তক্ষুনি ঘুরে ফিরে এলাম বটে, কিন্তু অরোরা ততক্ষণে তীরের কাছে পৌঁছে গেছে। খাঁ-খাঁ

করছে চারিদিক। মাঝে মাঝে বদ্ধ জলা, কোথাও দিগন্তবিস্তৃত কাদাজমি, কোথাও পচা শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদ ছাওয়া প্যাঁচপেঁচে মাঠ। অরোরা নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গেল এই কাদার দিকে এবং ধপ করে উঠে পড়ল কাদা ভরতি তীরের ওপর– সামনের গলুই ঠেলে উঠল শূন্যে– পেছনের দিকটা ডুবে গেল নদীর জলে। সঙ্গেসঙ্গে লাফ দিল পলাতক, কিন্তু কাঠের পা-খানা আমূল ঢুকে গেল কাদামাটির মধ্যে। বৃথা হল টানা-হ্যাচড়া, সমস্ত শরীর দুমড়ে মুচড়ে পা খোলার প্রাণান্ত চেষ্টা। এক পাও ফেলতে পারল না সামনে বা পিছনে। নিষ্ফল ক্রোধে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে লাফালাফি আর গায়ের জোর দেখাতে গিয়ে কাঠের খোঁটা আরও ভালো করে গেঁথে গেল কাদামাটির মধ্যে। লঞ্চ নিয়ে কাছে পৌছানোর পর তাকে কাদা থেকে টেনে তোলার জন্যে দড়ির ফাঁস ছুড়ে দিতে হল ঘাড়ের ওপর এবং অতিকষ্টে যেন কাদার সমুদ্র থেকে টেনে হিঁচড়ে উদ্ধার করল অতি করাল এক কুটিল মৎস্যকে। মুখ কালো করে লঞ্চে বসে ছিল স্মিথ। বাপবেটা কিন্তু হুকুম শুনেই সুড়সুড় করে উঠে এল পুলিশ লঞ্চে। অরোরাকে টেনে ভাসালাম জলে এবং বেঁধে নিলাম পেছনে। ডেকে পড়ে ছিল ভারতীয় কারুকার্য শোভিত নিরেট লোহার একটা সিন্দুক। নিঃসন্দেহে শোল্টোদের সেই অভিশপ্ত রত্নপেটিকা। চাবি নেই সিন্দুকের গায়ে– কিন্তু বেশ ভারী! ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলাম আমাদের ছোটো কেবিনে। স্রোতের প্রতিকূলে ঘসঘস শব্দে ধোঁয়া ছেড়ে ফেরবার সময়ে সার্চলাইট খুঁটিয়ে দেখলাম চারিদিক– কিন্তু পিশাচমুখো সেই দ্বীপবাসীকে আর দেখতে পেলাম না। টেমস নদীর তলদেশে তিমিরাবৃত আলয়ে জুড়োচ্ছে নিশ্চয় অর্ধ-পশু ভিনদেশীর ক-খানি হাড়। এদেশে আসাটাই কাল হয়েছে তার।

লঞ্চের খোলে নামবার পাটাতনের দরজার আঙুল তুলে হোমস বললে, দেখ, দেখ, পিস্তল ছুড়তেও দেরি করে ফেলেছিলাম। সত্যিই তো! যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম দুই বন্ধু, ঠিক সেই জায়গাটিতে কাঠের গায়ে বিঁধে রয়েছে কালান্তক সেই বিষ কাঁটা– যার মরণ মারের নিদর্শন আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

গুলি ছোড়ার সঙ্গেসঙ্গে আমাদের দু-জনের মাঝখান দিয়ে সাৎ করে উড়ে গিয়ে কাঠে বিঁধেছে বিষের তির। আমার দিকে তাকিয়ে অভ্যেস মতো হোমস মৃদু হাসল বটে, আমার কিন্তু হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল, কী করাল মৃত্যুর খপ্পর থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি ভাবতে গিয়ে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি, রক্ত ঠান্ডা হয়ে এসেছিল সেদিন সাক্ষাৎ যমদূতের মতো সেই বিষ কাটা কানের ঠিক পাশ দিয়ে শনশনিয়ে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করে।

১১। আগ্রা সম্পদ

কেবিনের মধ্যে বসে রইল আমাদের কয়েদি– সামনে রইল লোহার বাক্স- যে-বাক্সর লালসায় এত কু-কাণ্ড সে করেছে এবং এতদিন অপেক্ষা করে থেকেছে। লোকটা আগাগোড়া রোদে পোড়া, দুর্দান্ত এবং বেপরোয়া। মুখখানা যেন শক্ত লালচে মেহগনি কাঠ খোদাই করে তৈরি। অসংখ্য বলিরেখায় জর্জরিত সে-মুখ দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন খোলা হাওয়ায় প্রকৃতির মধ্যে রোদ-জলে বন্য জীবন কাটিয়েছে। দাড়ি-ঢাকা থুতনির গড়নটাও অদ্ভুত, সংকল্প সাধনে অটল চরিত্রের লক্ষণ– লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার শক্তি কারোর নেই। বয়স পঞ্চাশের ধারেকাছে– কেননা ঘনকৃষ্ণ ঢেউ-খেলানো চুলের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে অগুনতি সাদা রেখা। এমনিতে মুখটা বদ নয়, কিন্তু রেগে গেলে যে অন্য মানুষ, তা ওই গোঁয়ার থুতনি আর ভারী ভুরু দেখলেই অনুমান করা যায়, তখন মুখের চেহারা কতখানি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে স্বচক্ষে তা দেখেছি নদীবক্ষে। হাতকড়া বদ্ধ দু-হাত কোলে রেখে, বুকের ওপর মাথা ঝুলিয়ে চুপ করে বসে থাকলেও তীক্ষ্ণ ফুলিঙ্গময় চোখ জোড়া অনিমেষে চেয়ে আছে এত কুকর্মের নিমিত্ত লৌহপেটিকার পানে। আমার কিন্তু মনে হল লোকটার আড়ষ্ট আর দৃঢ় মুখভাবে রাগের বদলে দুঃখ বেশি পরিস্ফুট। একবার শুধু চাইল আমার পানে– ঝিকমিক চোখে দেখলাম কৌতুক জাতীয় ভাবের স্ফুরণ।

চুরুট ধরিয়ে হোমস বললে- জোনাথন স্মল, শেষটা এইরকম হওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত।

'আমিও, অকপট সুরে বললে স্মল। জানি আমি পার পাব না। ভগবানের দিব্যি, মি. শোল্টোর গায়ে আমি হাত দিইনি– বাইবেল ছুঁয়ে বলতে পারি। ওই বিটলে-কুত্তা টোঙ্গা ফস করে ছুড়ে বসল মারাত্মক তিরটা। কিছু করার ছিল না আমার– আমি বলিওনি তির ছুঁড়তে। আত্মীয় মরলে যেরকম বুক ভেঙে যায়,

সেইরকম কষ্ট হয়েছিল। দড়ি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়েছিলাম বিটলে বামনটাকে। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে।

হোমস বললে, চুরুট নাও, স্মল। আমার ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোক ব্রান্ডিও খাও। ভিজে একশা হয়ে গেছ দেখছি। এবার বলো তো, মি. শোল্টোর মতো প্রমাণ সাইজের মানুষকে কাবু করে ফেলবে তোমার ওই বিটলে কালো বন্ধুর মতো দুর্বল বেঁটে মানুষ– দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময়ে এ-বিশ্বাসটা তোমার মধ্যে ছিল কেন?

আপনি তো দেখছি অনেক খবর রাখেন। এমনভাবে বলছেন যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছেন। আসলে আমি ভেবেছিলাম ঘর ফাঁকা থাকবে। বাড়ির কার কী অভ্যেস, সব নখদর্পণে ছিল বলেই জানতাম ও সময়ে মি. শোল্টো নীচের তলায় খেতে যান। লুকোছাপার ধার দিয়েও যাব না, স্যার, সব খুলে বলছি। প্রাণ বাঁচাতে গেলে এখন সত্যি বলা ছাড়া আর পথ নেই। মি. শোল্টোর বদলে বুড়ো মেজর খুন হলে একটুও অনুশোচনা হত না। এই সিগার খাওয়ার মতোই ভাবনাটাকে ফুঁকে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু কী কপাল দেখুন, যার সঙ্গে কোনো ঝগড়া নেই, সেই ভদ্রলোকের খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম আমি।

তোমাকে খুনের দায়ে জড়াবে মি. অ্যাথেলনি জোন্স। আমার ঘরে উনিই তোমাকে নিয়ে আসবেন। তখন যা জান সব খুলে বললে, আমি লিখে নেব। মন খুলে যদি সব বল, তোমার উপকারে আসতে পারি। বিষটায় যে চক্ষের নিমেষে মানুষ মরে, আমি তা প্রমাণ করতে পারব। এত তাড়াতাড়ি মরে যে তুমি ঘরে ঢোকবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল মি. শোল্টো।

ঠিক বলেছেন, স্যার। জীবনে ওইরকম চমকাইনি। জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখি ঘাড় কাত করে দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল সেই দৃশ্য দেখে। মারতে মারতে টোঙ্গাকে আধমরা করে ফেলতাম– হাচড়পাচড় করে পালিয়ে গেল বলে। গদা আর কিছু কাঁটা ফেলে

গিয়েছিল সেইজন্যেই। আমাকে পরে বলেছিল। সেই জন্যেই মনে হয় আমার পেছন ধরতে সুবিধে হয়েছিল আপনার। কিন্তু কী করে যে পেছন পেছন এলেন ভেবে পাচ্ছি না। তার জন্যে আপনার ওপর আমার রাগ নেই। তবে ভাগ্যের কী পরিহাস দেখুন, তিক্ত হাসল স্মল– পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের মালিক হয়েও জীবনের অর্ধেক কাটালাম আন্দামান সাগরে ঢেউ ভাঙার পাথর বসিয়ে, বাকি অর্ধেক কাটাব ডার্টমুর জেলেরখ নর্দমা খুঁড়ে। সওদাগর আখমেতকে যেদিন থেকে দেখছি আর আগ্রা মণিমুক্তোয় নাক গলিয়েছি, সেদিন থেকেই অভিশাপ নেমেছে আমার জীবনে, অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি মণিমুক্তোর আসল মালিকও। তাকে মরতে হয়েছে খুনের দায়ে, আতঙ্ক আর অপরাধবোধে ভুগে মরতে হয়েছে মেজর শোল্টোকে, আর আমাকে সারাজীবন বেঁচে মরে থাকতে হবে স্রেফ গোলামগিরি করে।

ঠিক এই সময়ে ছোট্ট কেবিনে মুখ আর কাঁধ গলিয়ে অ্যাথেলনি জোন্স বললে, বাঃ চমৎকার ফ্যামিলি পার্টি জমেছে দেখছি। হোমস, আমাকে ফ্লাস্কটা দিন– এক ঢোক খাই।

কৃতিত্ব আমাদের সকলেরই– অভিনন্দন প্রাপ্য সবার। আরেকটাকে জ্যান্ত ধরতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু করার ছিল না। হোমস কাজটা ভালোই করলেন। অরোরাকে টেক্কা মারবার ব্যাপারেও আপনার হাত কম নয়। কী কষ্টে যে কাদা থেকে টেনে তুলতে হয়েছে তা আমিই জানি।

হোমস বললে, সব ভালো যার শেষ ভালো। তবে অরোরা যে এমন দৌড়বাজ তা জানা ছিল না।

স্মিথ বলছিল টেমস নদীতে অরোরার চাইতে জোরে যাওয়ার ক্ষমতা কোনো লঞ্চেরই নেই। একা পড়ে গিয়েছিল বলে, ইঞ্জিন সামলানোর জন্যে আর একজন সঙ্গে থাকলে টিকি ধরতে পারতাম না। তবে হ্যাঁ, নরউড কারবারের বিন্দুবিসর্গ ও জানে না।

চিৎকার করে বলল আমাদের কয়েদি, সত্যিই কিছু জানে না ও। লঞ্চ ভাড়া করেছিলাম অত জোরে যাওয়ার ক্ষমতা আর কোনো লঞ্চের নেই বলে। বলিনি কিছু? তবে টাকা দেদার। আরও দিতাম গ্রেভসএন্ডে এসমারেল্ডা জাহাজে পৌঁছে দিতে পারলে— সোজা পালাতাম ব্রেজিলে।

বেশ তো, স্মিথ যদি অন্যায় না-করে থাকে, তাহলে আমরাও দেখব তার ওপর যেন কোনো অন্যায় না হয়। ক্রিমিন্যালকে আমরা যত তাড়াতাড়ি পাকড়াও করি, সাজটা তত তাড়াতাড়ি দিই না! জোন্সের কথাবার্তা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। ফল নিয়েই সন্তুষ্ট সে— কীভাবে ফললাভ হল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এর মধ্যেই কৃতিত্ব গায়ে মাখবার চেষ্টা যে হোমসের কানও এড়ায়নি, তা ওর চোখ-মুখের ফিকে হাসি দেখেই বুঝলাম।

জোন্স বললে, ডক্টর ওয়াটসন রত্নবাক্স সমেত আপনাকে ভক্স-হল ব্রিজে নামিয়ে দেবখন। বুঝতেই পারছেন বড়ো দায়িত্ব নিচ্ছি— এ ধরনের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ কর্তারা অনুমোদন করেন না! তবে সঙ্গে একজন ইনস্পেকটর দেব দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন বলে। গাড়িতে যাবেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ গাড়িতে যাব।

কী মুশকিল দেখুন তো, চাবি নেই যে তালা খুলব। কিন্তু কী আছে সিন্দুকে তার ফর্দ না-করলেই নয়! তালাই ভাঙতে হবে দেখছি। ওহে, চাবিটা কোথায়?

নদীর তলায়, ছোট্ট করে জবাব দিল স্মল।

হুম! খামোকা ঝামেলাটা না-করলেই পারতে। অনেক ঝামেলাই তো পোয়াতে হল তোমার জন্যে। যাই হোক, ডাক্তার হুঁশিয়ার থাকবেন কিন্তু। বাক্স নিয়ে বেকার স্ট্রিটে যাবেন। পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পথে আমার বেকার স্ট্রিটের বাসা হয়ে যাবেন।

ভক্সহলে ভারী লোহার বাক্স সমেত আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওরা- সঙ্গে রইল সরল, অমায়িক এই ইনস্পেকটর। মিনিট পনেরো পরে গাড়ি পৌছল মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ি। এত রাতে বাড়িতে লোকের আগমন দেখে অবাক হল পরিচারক। মিসেস সিসিল ফরেস্টার সন্ধে নাগাদ বেরিয়েছেন– ফিরতে খুব রাত হতে পারে। মিস মর্সটান অবশ্য বসবার ঘরে আছেন। অগত্যা বাক্স হাতে আমি বসবার ঘরেই গেলাম– অনুগত ইনস্পেকটরকে রেখে গেলাম গাড়ির মধ্যে।

জানলার পাশে বসে ছিলেন মিস মর্সটান। পরনে সাদা স্বচ্ছ কাপড়ের পোশাক– কাঁধ আর কোমরের কাছে কেবল একটু লালের ছোয়া। বাক্স চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকায় ঢাকা দেওয়া আলোর নরম আভা খেলা করছে কোমল, গম্ভীর মুখে– যেন ধাতব ফুলিঙ্গ চিকমিকিয়ে উঠছে মাথাভরতি কুণ্ডলি পাকানো উদ্দাম কেশরাশির মধ্যে। একটা সাদা হাত ঝুলছে চেয়ারের পাশে- সমস্ত শরীর ঘিরে অদৃশ্য রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন গভীর বিষাদ– বসবার ভঙ্গিমার মধ্যেও প্রকট হয়েছে সুগভীর বিষন্নতা। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই অবশ্য লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে এবং ফ্যাকাশে গাল লাল হয়ে গেল আনন্দ আর বিস্ময়ের রোশনাইতে।

বললেন,'একটা গাড়ি এল শুনলাম বটে। ভাবলাম তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মিসেস ফরেস্টার– ভাবতেই পারিনি আপনি এসেছেন। বলুন কী খবর আনলেন।

খবরের চাইতেও ভালো জিনিস এনেছি, ভারী লোহার বাক্সটা টেবিলের ওপর বসাতে বসাতে খুশি উচ্ছল প্রাণবন্ত গলায় বললাম বটে, ভেতর ভেতর কিন্তু বুক ভেঙে গেল। এ সংসারে যার চাইতে বড়ো খবর আর হয় না, তাই এনেছি আপনার জন্যে। এনেছি কুবেরের ঐশ্বর্য।

লোহার বাক্সর দিকে চাইলেন মিস মর্সটান। বললেন অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে, এই সেই গুপ্তধন?

হ্যাঁ, সেই গুপ্তধন– আগ্রার হিরেমুক্তো। অর্ধেক আপনার– বাকি অর্ধেক থেডিয়াস শোল্টোর। লাখ দুয়েক পাবেন প্রত্যেকেই। বছরে দশ হাজার পাউন্ড বৃত্তি, ভাবতে পারেন? ইংল্যান্ডে আপনার মতো ধনবতী এখন ক-জন আছেন, আঙুল গুনে তা বলা যায়। বুক দশ হাত হচ্ছে না?

অতি-অভিনয় করে ফেলেছিলাম নিশ্চয়। উচ্ছাসটা যে ফাঁকা এবং অভিনয়টা যে নিষ্প্রাণ– তা লক্ষ করেই একটা ভুরু বেঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাইলেন মিস মর্সটান।

বললেন, এ-রত্ন আমার হলেও জানবেন ঋণী রইলাম আপনার কাছে।

আরে না, বললাম প্রতিবাদের সুরে– 'আমার কাছে নয়– ঋণী থাকুন আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে। দুনিয়ার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করলেও রত্ন উদ্ধারের সূত্র আমি বার করতে পারতাম না। ওর মতো প্রতিভাও ঘোল খেয়ে গেছে– শেষ মুহূর্তেও হাত ফসকে যাচ্ছিল আর কী।

বসুন ডক্টর ওয়াটসন, বলুন গোড়া থেকে। শেষ সাক্ষাতের পর কী ঘটেছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। বললাম কীভাবে তদন্তকে নতুন ধারায় চালনা করেছে হোমস, আরোরাকে আবিষ্কার করলাম কী কৌশলে। অ্যাথেলনি জোন্স হালে পানি না-পেয়ে এল কীভাবে এবং রাতের অভিযানে বেরিয়ে টেমস নদীর জলে কী সাংঘাতিক দৌড়। দৌড়ে তবে পাকড়াও করলাম অরোরাকে। দ্বিধাবিভক্ত ঠোঁট আর ঝিকিমিকি চোখ নিয়ে নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের ধারাবিবরণী তন্ময় চিত্তে শুনলেন মিস মর্সটান। অল্পের জন্যে বিষ-মাখানো তিরের মরণ চুম্বন থেকে বেঁচে গিয়েছি কীভাবে, শুনে সাদা হয়ে গেল মুখ– ভয় হল অজ্ঞান না হয়ে যান।

হন্তদন্ত হয়ে এক গেলাস জল এগিয়ে ধরতে বললেন, ও কিছু না– এই তো সামলে নিয়েছি। এ-রকম একটা ভয়ংকর বিপদের মধ্যে বন্ধুদের ঠেলে দিয়েছি ভেবে বুকটা কেমন যেন করে উঠেছিল।

বিপদ আর নেই। তা ছাড়া ভয়ংকর কিছুও তো নয়। যাকগে গা শিউরানো আর কিছু বলব না আপনাকে। ভালো ভালো কথা বলা যাক। এই নিন আপনার রত্নবাক্স! এর চাইতে ভালো কথা আর কী থাকতে পারে বলুনঃ প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি শুধু এই বাক্স নিজের হাতে আপনাকে হাতে তুলে দেব বলে– আপনিই এই ঐশ্বর্য সবার আগে দেখলে খুশি হবেন বলে।

'তা হব' বললেন বটে কিন্তু খুশির ঝলক ফুটল না কণ্ঠে। আসলে খুশি হব' কথাটা বললেন স্রেফ সৌজন্যের খাতিরে। প্রাণ যেতে বসেছিল যে জিনিসের জন্যে, তা বয়ে নিয়ে আসার পর খুশি না-হলে মনে আঘাত পাব বলেই বললেন আমার মন রাখতে।

বললেন বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে, ভারি সুন্দর বাক্স তো! ভারতীয় কারুকার্য। তাই না?

হ্যাঁ। কাশীর ধাতুর কাজ।

ভারীও কম নয়!

দু-হাতে বাক্সটাকে তোলবার চেষ্টা করে সবিস্ময়ে বললেন মিস মসটান 'শুধু বাক্সটার দামই কি কম! চাবি কোথায়?

টেমসের জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল স্মল। মিসেস ফরেস্টারের চুল্লি খুঁচোনোর ডান্ডাটা বরং আনি।

উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা ভারী মোটা আলতারাপ লাগানো ছিল সিন্দুকের সামনে। লোহার ডান্ডা ঢুকিয়ে চড় মারলাম। খটাং করে উপড়ে বেরিয়ে এল আলতারাপ। কম্পিত আঙুলে তুলে ফেললাম ডালা। চমকিত চিত্তে ফ্যাল ফ্যাল করে দু-জনে তাকিয়ে রইলাম বাক্সের গর্ভে। বাক্স একেবারেই শূন্য!

লোহার কারুকাজ করা চাদরটা এক ইঞ্চির দুই তৃতীয়াংশ পুরু। আগাগোড়া এই চাদরে মোড়া বলেই বাক্স এত ভারী। খুব দামি জিনিস বইবার উপযুক্ত করেই মজবুত, নিরেট ভাবে তৈরি বাক্স। অথচ একরতি সোনা বা হিরে মানিকও নেই ভেতরে। একদম খালি– বিলকুল শূন্য-গর্ভ!

শান্ত কণ্ঠে বললেন মিস মর্স্টান, রত্ন উধাও।

কথাটা শুনলাম, মানেটা বুঝলাম এবং যেন একটা বিশমনি পাথর বুক থেকে নেমে গেল। অলক্ষুণে এই আগ্রা-ঐশ্বর্যই যে বোঝা হয়ে মুষড়ে রেখেছিল আমাকে– বোঝা নেমে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তো এভাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারিনি। উপলব্ধিটা স্বার্থপরের উপলব্ধি, তা মানছি। অন্যায়, অনুচিত এবং অবিশ্বস্ত, তাও স্বীকার করছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা চিন্তায় তুরীয় আনন্দে মেতে উঠেছিলাম– স্বর্ণ প্রাচীর অদৃশ্য হয়েছে দু-টি হৃদয়ের মাঝখান থেকে।

বাঁচলাম! অন্তরের অন্তস্থল থেকে ছিটকে এল মনের কথা।

ও-কথা কেন বললেন? শুধোলেন মিস মসটান।

তোমাকে আবার আমার নাগালের মধ্যে ফিরে পেলাম বলে! তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি বলে। পুরুষ নারীকে যেভাবে হৃদয় দেয়, সেইভাবে আমি তোমায় হৃদয় দিয়েছি বলে, এই ঐশ্বর্য ও কথা বলার পথ বন্ধ করে রেখেছিল বলে। দু-হাতে মেরির হাত তুলে নিয়ে বললাম আমি– মেরিও হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না। ঐশ্বর্য আর নেই, কথাটা বলতেও আর বাধা নেই।

বলে দু-হাতে ওকে টেনে নিলাম কাছে। ফিসফিস করে ও বললে, তাহলে আমিও বলি তোমার মতো– 'আঃ! বাঁচলাম!'

সেই রাতে বিশ্বের কেউ হয়তো খুইয়েছে ঐশ্বর্য, আমি কিন্তু পেয়েছি আর এক ঐশ্বর্য।

১২। জোনাথন স্মলের বিচিত্র কাহিনি

গাড়িতে উপবিষ্ট ইনস্পেকটরের ধৈর্য আছে বলে, বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসার পরেও দেখলাম বসে আছে চুপটি করে। কিন্তু মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল শূন্যগর্ভ বাক্স দেখানোর পর।

বলল দমে-যাওয়া গলায়, পুরস্কারের বারোটা বাজল! টাকা না-পেলে কে দেবে পুরস্কার! পাওয়া গেলে আমি আর স্যাম ব্রাউন দু-জনেই পেতাম এক একটা দশ পাউন্ডের নোট।

আমি বললাম, তাতে কী? মি. থেডিয়াস শোল্টো বড়োলোক মানুষ। রত্ন পাওয়া না-গেলেও আপনাদের পুরস্কার দেবেন।

বলা সত্ত্বেও ঘুচল না ইনস্পেকটরের নৈরাশ্য। বললে মাথা নাড়তে নাড়তে, কাজটা কিন্তু ভালো হল না। মি. অ্যাথেলিন জোন্স ঠিক এই কথাই বলবেন।

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল সেই ভবিষ্যদবাণী। বেকার স্ট্রিটে ফিরে গিয়ে খালি বাক্স দেখানোর পর হা করে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ডিটেকটিভ জোন্স। কয়েদি আর হোমসকে নিয়ে সবে পৌঁছেছিল জোন্স— প্ল্যানটা একটু পালটে নিয়েছিল— পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে এসেছিল বেকার স্ট্রিটে। স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকারভাবে আর্মচেয়ারে বসেছিল হোমস, উলটোদিকে ডান পায়ের ওপর কাঠের পা-খানা তুলে বসেছিল স্মল। খালি বাক্সটা দেখাতেই চেয়ারে হেলান দিয়ে হেসে উঠল হো-হো করে।

রেগে গিয়ে বললে অ্যাথেলনি জোন্স, এ-কীর্তি তাহলে তোমার, স্মল।

সোল্লাসে বললে স্মল, হ্যাঁ, আমার কীর্তি। এমন জায়গায় রেখেছি রত্নভাণ্ডার যেখানে আপনাদের হাত পৌঁছোবে না। এ-রত্নভাণ্ডার আমার— আমি যদি তা না-পাই ভোগ করতে দেব না কাউকেই। শুনুন মশাইরা, শুনে রাখুন!

ঐশ্বর্য ভোগ করার অধিকার আছে শুধু চারজনের– আমার আর আন্দামান কারাগারের তিন আসামির– আর কারোর নেই! আমি যা কিছু করেছি, এদের তরফেই করেছি– আমার জন্যেও করেছি। চারের সংকেত গোড়া থেকেই ছিল– এখনও আছে। আমি জানি আমি যা করেছি– ওরাও ঠিক তাই করত, বিপুল এই সম্পদ শোল্টো বা মর্সটানের বংশধরের ভোগে দেওয়ার চাইতে টেমসের জলে ছুড়ে দিত। ওদের বড়োলোক করার জন্যে আখমেটের সর্বনাশ করিনি আমরা। বামন টাঙ্গা যেখানে, সিন্দুকের চাবি সেখানে– সিন্দুক ভরতি হিরে মানিকও পাবেন সেখানে। যেই দেখেছি নির্ঘাত আমাকে ধরে ফেলবেন আপনারা, তখন থেকেই হিরে মানিক লুকিয়ে ফেলেছি নিরাপদ জায়গায়। কপাল মন্দ আপনাদের- এ-যাত্রায় খালি হাতেই ফিরুন।

কড়া গলায় বললে অ্যাথেলনি জোন্স, স্মল, তুমি ঠকাচ্ছ আমাদের। হিরে মানিক টেমসের জলে ফেলার মতলব থাকলে পুরো সিন্দুকটাই জলে ফেলে দিতে– অনেক সহজেই কাজ সারা যেত।

এবং অনেক সহজেই তা ফের জল থেকে তুলে আনা যেত। আড়চোখে ধূর্ত ঝিলিক হেসে বললে স্মল। আমার পিছু নেওয়ার বুদ্ধি যার আছে, টেমসের তলা থেকে সিন্দুক তুলে আনার বুদ্ধিও তার আছে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। পাঁচ মাইলের ওপর ছড়ানো রয়েছে এক বাক্স হিরে মানিক– আর খোঁজা সম্ভব নয়। বুক ভেঙে গেছে মুঠো মুঠো হিরে মুক্তো ছড়াতে। কিন্তু এ ছাড়া আর পথ ছিল না। যে-মুহূর্তে দেখছি তিরের মতো এসে নাগাল ধরে ফেলছেন, সেই মুহূর্তে মনস্থির করেছি। কিন্তু এখন আর দুঃখ নেই? জীবনে অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি– কিন্তু কৃতকর্মের জন্যে কখনো পস্তাইনি।

ডিটেকটিভ বললে– স্মল ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আদালতকে এভাবে বোকা না-বানিয়ে যদি সাহায্য করতে, আখেরে তোমারই লাভ হত– অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যেতে।

'আদালত!' দংষ্ট্রা বার করে গর্জে উঠল জেল-খাটা আসামি। আদালতের মহিমা খুব জানা আছে! এ-ঐশ্বর্য যদি আমাদের ভোগে না-লাগে, তবে আর কার ভোগে লাগবে শুনি? রোজগার না-করেই একদল ভোগ করবে, এই তো আপনাদের আদালতের রায়, তাই না? নিজের হাতের রোজগার করা ঐশ্বর্য তুলে দেব অপরের হাতে? এ-ঐশ্বর্য আমার রোজগার করা– কীভাবে করেছি শুনবেন। বিশ বছর কাটিয়েছি এমন এক জলাভূমিতে জ্বরের কবল থেকে যেখানে কারো নিষ্কৃতি নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা খেটেছি, গরান গাছের তলায় সারারাত শেকলে বাঁধা থেকেছি অতি নোংরা কদর্য কুঁড়েঘরে, মশার কামড়ে ছটফট করেছি, কালাজ্বরের আক্রমণে কেঁপে মরেছি, কালামুখো পাষণ্ড পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে মৃত্যু শ্রেয় মনে করেছি। জানেন তো সাদা মানুষদের লাথিয়ে আর যন্ত্রণা দিয়ে কী বিকট উল্লাস পায় এই বিটলে কালো পুলিশরা। আগ্রার ঐশ্বর্য মুঠোয় এনেছি এইভাবে– আর আপনি কিনা আমাকে আদালতের মহিমা শোনাতে এসেছেন– কেন? না, এ-ঐশ্বর্য যারা রোজগার করেনি তাদের খপ্পরে তুলে দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না বলে। কী দাম দিয়েছি ভাবুন ঐশ্বর্য রোজগার করতে– সে কি অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে? অন্যের ভোগে লাগানোর জন্যে? আমি জেলখানায় দিন শেষ করব আর একজন আমার টাকা নিয়ে রাজার হালে প্রাসাদে বসে ফুর্তি করবে– এর চাইতে বরং টাঙোর বিষ-মাখানো তির মাচড়ায় ফুঁড়ে মরতে রাজি আছি।

সুখ দুঃখের উদাসীনতার বৈরাগ্য-মুখোশ খসে পড়েছে স্মলের মুখ থেকে-- কথাগুলো বলে গেল ঝড়ের মতো। যেন মত্ত প্রভঞ্জন হাহাকার রবে উড়ে এল জ্বালাময় কথার মধ্য দিয়ে। ভাটার মতো জ্বলতে লাগল দুই চোখ- কড়কড় শব্দে কাঁপতে লাগল হাতের হাতকড়া। মেজর শোল্টো কেন ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। ওই চেহারা, ওই ক্রোধ, ওই আত্যন্তিক আবেগ নিয়ে নেকড়ের মতো,স্মল তাড়া করছে তাকে। খবর পেয়েই

নিঃশেষ হয়ে এসেছিল তার জীবনীশক্তির। আতঙ্ক যার অমূলক নয়। ভয়টা ভিত্তিহীন নয়।

শান্তভাবে হোমস বললে, তুমি কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। এখনও পর্যন্ত তোমার কাহিনি আমি শুনিনি। কী হয়েছে তাও জানি না। কাজেই তোমার ওপর কতখানি অন্যায় হয়েছে সে-বিচার করাও মুশকিল।

আপনার কথাগুলো স্যার, বেশ পরিষ্কার। ব্যবহারটাও ভালো। তবে আমার হাতের এই লোহার বালার জন্যেই আপনি দায়ী– ধন্যবাদ সেজন্যে। কোনো রাগ নেই জানবেন। যা হয়েছে ভালোর জন্যেই হয়েছে। আমার কাহিনি শোনার ইচ্ছে হয়ে থাকলে গোপন করব না। যা বলব তার প্রতিটা কথা জানবেন নির্ভেজাল সত্য– ঈশ্বরের নামে দিব্যি গিলে বলছি। ধন্যবাদ। গেলাসটা পাশে রাখুন। গলা শুকিয়ে গেলে ভিজিয়ে নেবখন।

আমি উস্টার্সশয়ারের মানুষ, জন্মেছি পার্শোরে। ওদিকে গেলে অনেক স্মল পরিবার দেখতে পাবেন। মাঝে মাঝে ঘুরে আসার কথা ভেবেছি বটে, কিন্তু মন থেকে সাড়া পাইনি। বাড়ির লোকের কাছে আমি ছিলাম অপদার্থ- তাই আমার শ্রীমুখ দেখেও কেউ খুশি হবে না বলেই যাইনি। ওরা ধার্মিক, সদাচারী, নিয়মিত গির্জেয় যায়, চাষবাস করে ও অঞ্চলের সবার শ্রদ্ধার পাত্র– এক ডাকেই চেনে সবাই। আমি কিন্তু ছন্নছাড়া উঞ্ছ টাইপের ছিলাম গোড়া থেকেই। আঠারো বছর বয়সে নিস্কৃতি দিলাম আত্মীয়দের। একটা মেয়েঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। দেশ ছেড়ে পালাতে হল শেষ পর্যন্ত। থার্ড বাফস সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে পালিয়ে গেলাম ভারতবর্ষে।

তবে আমার অদৃষ্ট লিখন অনুসারে সৈন্যবাহিনীতে বেশিদিন থাকার কথা নয়। হাঁটু না-বেঁকিয়ে গজ-স্টেপ কুচকাওয়াজ শেখবার পর সবে বন্দুক চালানোটা রপ্ত করেছি, এমন সময়ে বোকার মতো সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম গঙ্গায়। কপাল ভালো, তাই আমার সঙ্গেই জলে নেমেছিল সার্জেন্ট জন হোল্ডার–

বাহিনীতে ও-রকম দক্ষ সাঁতারু আর একজনও নেই। মাঝগঙ্গায় যেতেই আমাকে তাড়া করল একটা কুমির, কচাৎ করে কামড়ে নিয়ে গেল ডান পা-খানা– ঠিক যেন হাঁটুর ওপর থেকে পা কেটে বাদ দিলে হাসপাতালের সার্জন। রক্তপড়ার জন্যে বটে, আর যন্ত্রণার জন্যেও বটে, অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি। জন হোল্ডার আমাকে তীরে টেনে না-নিয়ে এলে ডুবে মরতাম নির্ঘাত। হাসপাতালে পাঁচ মাস থাকার পর কাঠের পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে এসে দেখলাম পঙ্গু হওয়ার দরুন সৈন্যবাহিনী থেকে আমার নাম কাটা গিয়েছে এবং খেটে খাওয়ার মতো কোনো কাজ আর নেই।

বুঝতেই পারছেন মি. মন্দভাগ্য নিয়ে দিনগুলো তখন কাটিয়েছি। বিশ বছরও বয়স নয় তখন– অথচ পঙ্গু। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যেই অবশ্য করেন– দুর্ভাগ্যটা আসলে ছদ্মরূপী সৌভাগ্য বোঝা গেল দু-দিনেই। নীলের চাষ করেছিলেন অ্যাবেল হোয়াইট নামে এক ইংরেজ। একজন কুলির সর্দার দরকার ছিল তার লোকজনদের কাজকর্ম তদারক করার জন্য। অ্যাবেল হোয়াইটের বন্ধু ছিলেন আমার কর্নেল। দুর্ঘটনার পর থেকেই আমার ওপর একটু দুর্বলতা ছিল কর্নেলের কথা না-বাড়িয়ে বলি, কর্নেলের জোরালো সুপারিশে পেয়ে গেলাম চাকরিটা। পা না-থাকলেও কাজটা কঠিন নয়। কেননা, তদারকি করতে হবে ঘোড়ায় চেপে এবং যেটুকুও হাঁটু ছিল, তা দিয়ে জিন চেপে ধরতে পারতাম। খেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া, কুলিদের কাজ দেখা আর ফাঁকিবাজির খবর মালিককে এনে দেওয়া– এই তো কাজ! মাইনেও ভালো। কোয়ার্টার চমৎকার। শেষ জীবনটা নীল কুঠিতেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। মি. অ্যাবেল হোয়াইট মানুষ খুব ভালো। প্রায় আসতেন আমার দীন কুটিরে, তামাক পাইপ টানতেন একসঙ্গে বসে। স্বদেশে সাদা মানুষেরা কেউ কাউকে দেখতে পারে না– বাইরে গেলে কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেকের প্রাণ কাঁদে।

এমন সুদিন কিন্তু বেশিদিন টিকল না। আচমকা বিন্দুমাত্র জানান না-দিয়ে শুরু হয়ে গেল সিপাই বিদ্রোহ। সারে অথবা কেন্টের মতোই যে-দেশ শান্ত নিস্তরঙ্গ ছিল, আচমকা সেই দেশে তাণ্ডবনাচ আরম্ভ করল দু-লক্ষ কালো পিশাচ– নিমেষে সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হল ভারতবর্ষ। সবই জানেন আপনারা, আমার চাইতেও বেশি খবর রাখেন– কেননা– পড়াশুনার ধাত আমার একেবারেই নেই। আমি যা দেখেছি শুধু তাই বলতে পারি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্তে মথুরা বলে একটা জায়গায় ছিল আমাদের নীলের চাষ। রাতের পর রাত দেখেছি আকাশ লাল হয়ে রয়েছে জ্বলন্ত বাংলোর আভায়; আর দিনের পর দিন ছোটো ছোটো দলে ইউরোপীয়রা বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের খেত মাড়িয়ে গিয়েছে আগ্রার দিকে– সবচেয়ে কাছের সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেখানে। মি. অ্যাবেল হোয়াইট ছিলেন বড়ো জেদি পুরুষ। ওঁর ধারণা ছিল, গোলমালটা হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি হঠাৎ থিতিয়ে যাবে। আসলে যা হচ্ছে, গুজব ছড়াচ্ছে তার চেয়ে বেশি। রং চড়ানো গল্পে কান না-দিয়ে বারান্দায় বসে হুইস্কি আর চুরুট খেতেন– চারদিকে তখন শুধু আগুন আগুন। বাধ্য হয়ে আমি তো রইলাম, স্ত্রীকে নিয়ে ডসন-ও থেকে গেল কুঠিতে। ডসন খাতাপত্র লিখত, অফিস দেখত। ঝকঝকে পরিষ্কার। একদিনেই কিন্তু ঘনিয়ে এল বিপদ- সর্বনাশ হয়ে গেল একদিনেই। দূরের খেত থেকে ঘোড়ায় চেপে ফিরছি। সন্ধে হয়ে এসেছে, কদমচালে যেতে যেতে একটা খাড়াই নালার তলায় তালগোল পাকানো কী একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখি ডসনের স্ত্রী। রক্ত হিম হয়ে গেল মৃতদেহের অবস্থা দেখে। ছুরি দিয়ে ফলাফলা করে মারার পর নালার মধ্যে ফেলে যাওয়ায় খুবলে খুবলে খেয়ে গেছে লেড়ি কুত্তা আর শেয়াল। কিছু দূরে রাস্তার ওপর পড়ে ডসন নিজে। হাতে একটা রিভলবার; গুলি নেই; কিন্তু সামনে ধরাশায়ী চারজন সিপাই। ঘোড়ার রাশ ধরে ভাবছি কোনদিকে যাব, এমন সময়ে দেখলাম দূরে ঘন কালো ধোয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে অ্যাবেল হোয়াইটের বাংলো

থেকে– লকলকে আগুনের শিখাও বেরিয়ে আসছে ছাদ ফুড়ে। এ অবস্থায় অন্নদাতাকে বাঁচাতে যাওয়া মূর্খতা। কিছুই করতে পারব না, উলটে আমার প্রাণ যাবে। লাল কুর্তা পরে শয়ে শয়ে কালো পিশাচ তাথই তাথই নাচছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে জ্বলন্ত বাড়ি ঘিরে! আমার দিকে চোখ পড়ল জনা কয়েকের, সঙ্গেসঙ্গে শন শন করে কয়েকটা বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধানখেতের ওপর দিয়ে লম্বা দিলাম আগ্রার দিকে। মাঝরাতে পৌঁছোলাম সেখানকার পাঁচিল-ঘেরা নিরাপদ আশ্রয়ে।

দেখা গেল, নিরাপত্তা সেখানেও বিশেষ নেই। চাকভাঙা মৌমাছির মতো পাগলা হয়ে গিয়েছে সারাদেশ। ইংরেজরা দল বেঁধে এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে স্রেফ বন্দুকের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে বিদ্রোহীদের। বন্দুকের জোর যেখানে নেই, সেখানে অসহায়ভাবে দলে দলে পালাচ্ছে। দশ লক্ষর বিরুদ্ধে কয়েকশো লোক যেমন কিছুই নয়– বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো এই উন্মত্ত সিপাহীদের সামনে মুষ্টিমেয় ইংরেজও কিছু নয়। সবচেয়ে সর্বনাশ হয়েছে আমাদের ট্রেনিং নিয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে সিপাহীরা– যাদের আমরা লড়তে শিখিয়েছি, বন্দুক ধরতে শিখিয়েছি, কামান ছুড়তে শিখিয়েছি, বিউগল বাজাতে শিখিয়েছি– তারাই এখন আমাদের ঘোড়া, হাতিয়ার, রণকৌশল নিয়ে কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদেরই ওপর। আগ্রায় মোতায়েন ছিল থার্ডবেঙ্গল ফিউজিলীয়ার– হালকা বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনী– কিছু শিখ, দু-দল অশ্বারোহী সৈন্য; আর একদল গোলন্দাজ। কেরানি আর ব্যবসাদারদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি হয়েছিল– কাঠের পা নিয়ে আমি তাতে যোগ দিলাম, জুলাইয়ের গোড়ার দিকে সাহগঞ্জে খুব একচোট লড়লাম বটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে, কিন্তু বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় পালিয়ে আসতে হল শহরের মধ্যে।

চারদিক থেকে তখন খারাপ খবর আসছে, আসাটাই স্বাভাবিক। ম্যাপ দেখলেই বুঝবেন আমরা ছিলাম ঠিক মাঝখানে, শ-খানেক মাইল পূর্বে লক্ষ্ণৌ,

দক্ষিণে প্রায় ওইরকম দূরত্বে কানপুর। চারদিকে কেবল অত্যাচার, হত্যা, উৎপীড়ন।

আগ্রা শহরটা আয়তনে বিরাট। ছত্রিশ জাতের নিবাস। গোড়া ধর্মান্ধ শয়তান মৌলবাদীতে ঠাসা। সরু সরু গলিখুঁজির মধ্যে প্রায় হারিয়ে গেল বললেই চলে আমাদের মুষ্টিমেয় লোকজন। যাই হোক, নদী পেরিয়ে এসে ঘাঁটি গাড়লাম আগ্রার পুরোনো কেল্লায়। প্রাচীন এই কেল্লা সম্বন্ধে আপনারা কেউ কিছু পড়েছেন কি শুনেছেন কিনা জানি না। বড়ো অদ্ভুত জায়গা– জীবনে এ-রকম অদ্ভুত দুর্গ আমি দেখিনি– আমি নিজেও ছিলাম একটা আশ্চর্য জায়গায়। প্রথমত, কেল্লাটা আকারে পেল্লায়। কয়েক একর জায়গা জুড়ে একখানা কেল্লা। আধুনিক অংশে শহর রক্ষার বাহিনী, মেয়েদের, বাচ্চাদের খাবারদাবারের ভাড়ার এবং সবকিছুর জায়গা করে দেওয়ার পরেও রাশি রাশি ঘর খালি পড়ে রয়েছে তখনও। তা সত্ত্বেও পুরোনো পরিত্যক্ত অংশের তুলনায় আধুনিক অংশ কিছুই নয়– সেখানে কেউ যায় না; বিছে, কেঁচো, মাকড়সা জাতীয় বহুপদী প্রাণী ছাড়া কেউ থাকে না। সেখানকার বড়ো বড়ো হল ঘর, টানা লম্বা অলিন্দের গোলকধাঁধায়, পরিত্যক্ত নাচঘর আর ধু-ধু শূন্য গলিপথে পথ হারিয়ে ফেলে নতুন মানুষরা। শুধু এই কারণেই পরিত্যক্ত সেই মহলে যাওয়া নিষেধ সকলের– তা সত্ত্বেও নতুন দল এলে উঁকিঝুঁকি মেরে মিটিয়ে আসে কৌতূহল।

দুর্গের একদিকে নদী থাকার ফলে সেদিক সুরক্ষিত। কিন্তু অন্যদিকের বিস্তর দরজা জানালায় কড়া পাহারা বসানো দরকার। এ-রকম অগুনতি প্রবেশপথ রয়েছে পেছনের পরিত্যক্ত মহলেও। আমাদের লোকবলও খুব কম, কোনোমতে কেল্লার কোণ আগলানো আর বন্দুক চালানো যায়। কাজেই অগুনতি দরজার প্রতিটিতে কড়া পাহারা বসানো সম্ভব ছিল না। তাই কেল্লার মাঝে একটা কেন্দ্রীয় প্রহরী ভবন করে প্রত্যেকটা গেটে একজন সাদা চামড়ার অধীনে জনা দু-তিন কালা আদমি মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটা

নিরালা দরজার ভার পড়েছিল আমার ওপর এক নির্দিষ্ট রাত-প্রহর থেকে। দু-জন শিখ সৈন্য ছিল আমার অধীনে। আমার ওপর হুকুম ছিল গোলমাল দেখলেই যেন বন্দুক ছুঁড়ি– আওয়াজ শুনলেই কেন্দ্রীয় প্রহরী ভবন থেকে দৌড়ে আসবে লোকজন। যেখানে ছিলাম, প্রহরী ভবন সেখান থেকে দু-শো গজ দূরে এবং এই দু-শো গজের মধ্যে এত বেশি গলিখুঁজির গোলকধাঁধা যে সত্যিই আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেলে বন্দুক ছোড়া সত্ত্বেও সময়মতো সাহায্য এসে পৌছোবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।

একে তো একখানা পা নেই, তার ওপর সেনাবাহিনীতে আনকোরা, কাজেই এই ছোট্ট দলের অধিনায়ক হতে পেরে বুকটা দশ হাত হয়ে উঠল। দু-রাত পাহারা দিলাম পাঞ্জাবিদের নিয়ে। দু-জনেই তালঢ্যাঙা, ভীষণ দর্শন। চিলিরানওয়ালার এককালে অস্ত্র ধরেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। দারুণ লড়নেওয়ালা। নাম, মাহোমৎ সিং আর আবদুল্লা খান। ইংরেজি ভালোই বলত; কিন্তু আমার সঙ্গে বিশেষ কথা হত না। আলাদা দাঁড়িয়ে অদ্ভুত গুরুমুখী ভাষায় বকর বকর করত সারারাত। আমি দাঁড়াতাম গেটের বাইরে। নজর রাখতাম চওড়া আঁকাবাঁকা নদী আর আলো চিকমিকে মিরাট শহরের ওপর। নদীর ওপর থেকে ভেসে আসত ঢাকের বাদ্যি, টম টম ড্রাম পেটার খটখটখটাখট আওয়াজ, বিদ্রোহীদের হুংকার আর উল্লাশ, আফিংয়ের নেশায় জড়ানো কন্ঠে চেঁচামেচি আর মাঝে মাঝে বন্দুকের নির্ঘোষ- বিপজ্জনক প্রতিবেশীরা যে সজাগ এবং সক্রিয়– সারারাত বোঝা যেত ওই চিৎকার আর আওয়াজের মধ্যে। দু-ঘণ্টা অন্তর রাতের অফিসার টহল দিয়ে দেখে যেত সব ঠিক আছে কিনা– কোনো পোস্ট বাদ দিত না।

তৃতীয় রাত্রে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশ অন্ধকার, মাটি প্যাচপ্যাচে। এই আবহাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফটকের বাইরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বড়ো কষ্টকর। শিখ অনুচরদের কথা বলানোর চেষ্টা করেও পারলাম না। রাত দুটোর

সময়ে টহলদার অফিসার ঘুরে যাওয়ার পর একঘেয়েমি একটু কাটল। সঙ্গীরা কেউ কথা বলতে চায় না দেখে বন্দুক রেখে তামাকের পাইপ দিয়ে দেশলাই ঘষতেই ধাঁ করে শিখ দু-জন লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর। একজন খপ করে বন্দুক তুলে নিয়ে তাক করল আমার কপালে, একজন গলায় প্রকাণ্ড ছুরি চেপে ধরে হিসহিসিয়ে বললে, নড়লেই টুটি দু-টুকরো হবে।

প্রথমে ভাবলাম দু-জনেই বুঝি বিদ্রোহীর চর এবং আক্রমণ শুরু হল বলে। সিপাইরা ফটক দখল করলে পিল পিল করে ঢুকে পড়বে ভেতরে। বাচ্চা আর মেয়েদের কেটে টুকরো টুকরো– যা করেছে কানপুরে। পতন ঘটবে আগ্রা কেল্লার। ভাববেন না যেন সাফাই গাইবার চেষ্টা করছি– কিন্তু সেই মুহূর্তে কেল্লার পতন ঘটতে চলেছে আশঙ্কা করে হা করেছিলেন। ছুরি খেয়েও সবাইকে চেঁচিয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে। যে-লোকটা ছুরি ধরেছিল গলায়, সে যেন আমার উদ্দেশ্য আঁচ করেই বললে ফিসফিস করে, ‘চেঁচাবেন না সাহেব। কেল্লা নিরাপদ। নদীর এপারে বিদ্রোহী কুত্তারা কেউ নেই। গলা শুনে বুঝলাম কথাটা সত্যি এবং আওয়াজ করলেই আমি মরব। তারা কী চায় আমার কাছে শোনবার জন্যে চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম।

ওদের মধ্যে আবদুল্লা খানের চেহারাটাই সবচেয়ে ভীষণ– ঢাঙাও বেশি। আবদুল্লাই বললে চাপা গলায়, শুনুন সাহেব, হয় এখন থেকে আপনি আমাদের একজন হবেন, নইলে খতম হবেন। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ– জান নিতে একটুও দ্বিধা করব না জানবেন। হয় আপনি খ্রিস্টের নামে ক্রুশ কাঠ ছুঁয়ে শপথ করে বলবেন আজ থেকে আমাদের একজন হয়ে গেলেন– নইলে মরবার জন্যে তৈরি হবেন। ওই খানায় লাশ ফেলে দিয়ে নদী পেরিয়ে ভিড়ে যাব বিদ্রোহী সিপাইদের দলে জাতভাইদের সঙ্গে। মাঝপথ নেই সাহেব। বলুন কী চান? বাঁচতে চান, না মরতে চান? তিন মিনিট সময় দিলাম ভাববার– হাতে সময় বেশি নেই– টহলদার অফিসার আসার আগেই যা করবার শেষ করতে হবে।

আমি বললাম, এ তো মহা মুশকিল? কী চাও তোমরা তাই এখনও বলনি। না-শুনে শপথ করি কী করে? তবে হ্যাঁ, কেল্লা দখল করার ব্যাপারে যদি আমাকে দলে টানতে চাও তাহলে আর দেরি কোরো না– স্বচ্ছন্দে টুটি কাটতে পার আমার।

আবদুল্লা বললে, কেল্লা দখলের ব্যাপার এটা নয়। আপনার জাতভাইরা যেজন্যে এদেশে এসেছে, আপনাকেও তাই করতে চাইছি। বড়োলোক করতে চাইছি। আজ রাত থেকে যদি নাম লেখান আমাদের খাতায়, মনে প্রাণে এক হয়েছি বলে শপথ করেন, তাহলে কোনো ভারতীয় যে-শপথ জীবন গেলেও ভাঙে না সেই শপথ আমরা করব। তিন সত্যি করে বলুন– আমাদের লুঠের বখরা আপনিও পাবেন। হিরে মানিকের চার ভাগের এক ভাগ আপনার হবে। এর চাইতে ভালো শর্ত আর কী হতে পারে বলুন!

আমি বললাম, কিন্তু কোন হিরে মানিকের কথা বলছ, তাই তো বুঝলাম না। তোমাদের মতো আমারও খুব ইচ্ছে রাজা বাদশা হওয়ার, কিন্তু হওয়া যায় কী করে সেটা আগে বলো।

আবদুল্লা বললে, তাহলে শপথ করুন বাবার নামে, মায়ের নামে, ধর্মের নামে যে এখন বা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থাতেই আমাদের গায়ে হাত তুলবেন না, আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না?

আমি বললাম, শপথ করছি শুধু একটা শর্তে– কেল্লার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে চলবে না।

তাহলে আমি আমার দোস্ত দু-জনেই শপথ করছি– লুটের বখরা আপনিও পাবেন এবং সমানভাবে ভাগবাঁটোয়ারা হবে চারজনের মধ্যে।

কিন্তু আমরা তো মোটে তিনজন, বললাম আমি।

না, না। দোস্ত আকবরও পাবে বখরা। ওরা আসছে এইদিকেই– সেই ফাঁকে গল্পটা বলি শুনুন। মাহোমৎ সিং, তুমি গেটে দাঁড়াও, এলেই খবর দেবে।

সাহেব, এ-কাহিনি আপনাকে বলছি শুধু আপনি শপথ করেছেন বলে। ফিরিঙ্গিরা শপথ রাখে– আপনাকে তাই বিশ্বাস করা যায়। 'উত্তরপ্রদেশের একজন রাজা আছে। ভূমিস্বত্ব কম থাকলেও ঐশ্বর্য তার প্রচুর। পৈতৃক সূত্রে অনেক টাকা তো পেয়েছেই, নিজেও জমিয়েছে তিল তিল করে। লোক খুব খারাপ, ভোগ করতে জানে না, কেবল জমাতেই জানে। সোনা জমানোর বাতিক প্রচণ্ড। গোলমালের শুরুতে সাপের মুখেও চুমু খেয়েছে, ব্যাঙের মুখেও চুমু খেয়েছে, একদিকে সিপাই আর একদিকে কোম্পানিরাজের ভজনা করেছে। দু-দিনেই অবশ্য বুঝেছে দিন ফুরিয়েছে সাদা মানুষদের। দেশের নানা দিক থেকে কেবল খবর আসছে ইংরেজদের পতন ঘটছে, দলে দলে ইংরেজরা মৃত্যুবরণ করছে। তবে লোক অত্যন্ত ধড়িবাজ বলেই একটা অপূর্ব প্ল্যান এঁটেছে রাজা। অবস্থা যাই দাঁড়াক না কেন, ঐশ্বর্যের অর্ধেক যেন থেকে যায় কাছে। সোনা রুপোর যা কিছু আছে থাক প্রাসাদের তোষাখানায়। কিন্তু দামি দামি রত্ন আর বাছাই করা মুক্তো একটা লোহার বাক্সের মধ্যে নিয়ে একজন বিশ্বাসী অনুচর সওদাগরের ছদ্মবেশে আগ্রা কেল্লায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখুক শান্তি ফিরে না-আসা পর্যন্ত। বিদ্রোহীরা জিতলে সোনাদানা থেকে যাবে, কোম্পানি জিতলে হিরে জহরত ফিরে পাওয়া যাবে, জমানো ঐশ্বর্য এইভাবে দু-ভাগ করে দিয়ে রাজাসাহেব সিপাইদের হয়ে খুব লড়ছে– কেননা তার রাজ্যের সেপাইদের দাপট বেশি। সাহেব, নুন খেয়ে যারা নিমকহারামি করেনি– এর ফলে রাজার এই সম্পত্তিতে কিন্তু তাদেরই অধিকার জন্মাচ্ছে।

ছদ্মবেশী এই সওদাগর আখমেত নাম নিয়ে আগ্রা শহরে পৌঁছে গেছে– এখন কেল্লায় ঢোকবার ফিকিরে আছে। আমার এক পালিত ভাই পথসঙ্গী হিসেবে আখমেতের সঙ্গে রয়েছে। এর নাম দোস্ত আকবর– সিন্দুকের গুপ্তকথা শুধু সেই জানে। আজ রাতেই আখমেতকে কেল্লার খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে কথা দিয়েছে দোস্ত আকবর– এবং তারা আসছে এই দরজার দিকেই।

এখুনি এসে পড়বে–এসে দেখবে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আমি আর মাহোমৎ সিং। এত ফাঁকা জায়গায় কেউ জানতেও পারবে না, কে এল। আখমেতের খবর দুনিয়ার আর কেউ পাবে না– কিন্তু রাজার বিপুল ঐশ্বর্য চার ভাগ হয়ে যাবে আমাদের মধ্যে। কীরকম লাগল বলুন সাহেব।

উর্স্টার্সশায়ারের প্রাণের দাম থাকতে পারে, কিন্তু মৃত্যু যেখানে পদে পদে– বন্দুকের গুলি, রক্ত আর আগুন যেখানে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে– প্রাণ জিনিসটা এমন কিছু বিরাট বা পবিত্র সেখানে নয়। আখমেত মরুক বাঁচুক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু দেশে ফিরে পকেট বোঝাই মোহর বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং একদিন যারা আমাকে অপদার্থ মনে করেছিল তাদের নাকের ডগার ওপর রাজার হালে দিন কাটাচ্ছি ভাবতেই পুলকিত বোধ করলাম। কাজেই মন আমার ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আবদুল্লা ভাবলে দ্বিধায় পড়েছি, তাই আরও পীড়াপীড়ির সুরে বললে:

সাহেব, কম্যান্ডারের হাতে এ-লোক ধরা পড়লে নির্ঘাত ফাঁসির দড়ি বা বন্দুকের গুলিতে মরবে, জহরত যাবে সরকারি তোষাখানায়, তাতে কারো লাভ হবে না। কিন্তু জহরত যদি আমরা নিই, বাকিটুকুই-বা সরকারের হয়ে করব না কেন? জহরতের বাক্স সরকারের তোষাখানায় যাওয়ার বদলে কেবল আমাদের পকেটে আসবে। চারজনের প্রত্যেকেই রাতারাতি বড়োলোক হয়ে যাব, জমিদার পর্যন্ত হব। কিন্তু কেউ জানবে না– কাকপক্ষীও নেই এখানে কী করলাম দেখার জন্যে। এত বড়ো সুযোগ কী পায়ে ঠেলা উচিত? আবার বলুন তো সাহেব সঙ্গে আছেন কিনা– না কি আপনাকে শত্রু হিসেবেই দেখতে হবে?

বললাম, মনে প্রাণে তোমাদের সঙ্গে রইলাম!

বন্দুকটা ফিরিয়ে নিল আবদুল্লা। বলল, এই তো চাই। আপনাকে পুরো বিশ্বাস করি আমরা। জানি, আমাদের মতো আপনার কথারও অন্যথা হবে না। আসুন এখন ভাই আর সওদাগরের অপেক্ষায় থাকা যাক।

প্ল্যানটা তারই- তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে। চলুন গেটে গিয়ে মাহোমৎ সিংয়ের সঙ্গে নজর রাখা যাক ।

বর্ষার শুরু বলে সমানে বৃষ্টি পড়ছিল। ভারী বাদামি মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশে, পাথরের ছাঁচ ছাড়া চোখে পড়ছে না, কিছু সামনের গভীর পরিখার অনেক জায়গায় জল শুকিয়ে গেছে– হেঁটে পেরিয়ে আসা যায় অনায়াসে। দু-জন পাঞ্জাবির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি এই পরিবেশে এমন একজনের প্রতীক্ষায় যে আসছে কেবল মরতে। ভাবতেও অবাক লাগে।

আচমকা পরিখার অপর পারে ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠনের ঝিলিক দেখলাম! স্তূপীকৃত রাবিশের আড়ালে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল আলো– ফের দেখা গেল অন্যপাশে– আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চাপা গলায় বললাম, এসে গেছে!

ফিসফিস করে আবদুল্লা বললে, আপনি গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবেন– কেখেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে সব জিজ্ঞেস করবেন। ঘাবড়ে দেবেন না। আমাদের সঙ্গে ভেতর পাঠিয়ে দেবেন। তারপর যা দরকার আমরা করব– আপনি এখানেই পাহারায় থাকবেন। লণ্ঠনের ঢাকা খোলবার জন্যে তৈরি থাকুন– ভালো করে দেখে নিতে চাই সেই লোক কিনা!

আলোটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছিল সামনে। কখনো থামছে, কখনো এগোচ্ছে। তারপর পরিখার ওপারে কালো মূর্তি দেখতে পেলাম। ঢালু পাড় বেয়ে কোনোমতে নামল নীচে, জলা জায়গা পেরোল ছপাং ছপাং শব্দে, ঢালু পাড় বেয়ে গেটের দিকে অর্ধেক উঠতেই চাপা হুংকার ছাড়লাম ওপর থেকে।

কে যায়?

বন্ধু! জবাব এল নীচে থেকে। লণ্ঠনের ঢাকা খুলে জোরালো আলো ফেললাম মুখের ওপর। সবার আগে রয়েছে একজন বিপুলকায় শিখ। কালো দড়ি লুটোচ্ছে কোমর-বন্ধ পর্যন্ত। সার্কাস বা প্রদর্শনীর বাইরে সচরাচর এ-রকম

তাল-ট্যাঙা মানুষ চোখে পড়ে না। অন্য লোকটা বেঁটে, মোটা, গোলগাল। মাথায় হলদে পাগড়ি। হাতে শাল মোড়া একটা পোটলা। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে বেচারা। ঠিক যেন পালাজ্বর হয়েছে এমনিভাবে থরথর করে কেঁপে উঠছে দু-হাত– গর্ত থেকে ইঁদুর মুখ বাড়িয়ে যেমন জ্বল জ্বল করে তাকায় আশেপাশে-তেমনিভাবে ভয়ার্ত মুণ্ডু ডাইনে বাঁয়ে ফিরিয়ে ঝকঝকে চোখে কী যেন দেখতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে। এ-লোককে খুন করতে হবে ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। তার পরেই অবশ্য রত্নপেটিকার কথা মনে এনে মনটাকে চকমকি পাথরের মতো শক্ত করে ফেললাম। আমার সাদা মুখ দেখে লোকটা আনন্দে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়োতে দৌড়োতে ছুটে এল আমার কাছে।

বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, বাঁচান সাহেব, আমাকে বাঁচান। দীন দুঃখী সওদাগর আখমেতকে আশ্রয় দিন। আগ্রা ফোর্টে এসে বাঁচবার জন্যেই রাজপুতনা হেঁটে পেরিয়ে এসেছি! কোম্পানি আমার মা-বাপ বলে আমাকে ওরা বেধড়ক মেরেছে, গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়েছে, টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। আজ আমার বড়ো সুদিন– ফের পেয়েছি আপনাদের আশ্রয়। আমার সামান্য সম্বল আজ থেকে নিরাপদ।

কী আছে তোমার পুটলিতে? শুধোলাম আমি।

ও বলল, লোহার বাক্স। সামান্য পারিবারিক স্মৃতি রেখেছি ভেতরে। অন্যের কাছে কোনো দামই নেই- আমার কাছে অমূল্য। তাহলেও জানবেন আমি ভিখিরি নই। আশ্রয় যদি দেন তো মোটা পুরস্কার পাবেন আপনি আর আপনার সরকার।

লোকটার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলার মতো ভরসাও রাখতে পারলাম না নিজের ওপর। ভয়ে ফ্যাকাশে চর্বি থলথলে মুখটার দিকে যতই তাকাই ততই মনে হয় ঠান্ডা মাথায় এ-লোককে কি মারা যায়? অসম্ভব! ধুত্তোর, যা হবার হয়ে যাক।

বললাম, ভেতরে প্রধান প্রহরীর কাছে নিয়ে যাও একে। পাঞ্জাবি দু-জন ওর দু-পাশে থেকে নিয়ে গেল ভেতরে– পেছনে রইল অসুরের মতো শিখটা। অন্ধকার গলিপথের মধ্যে তালে তালে পা ফেলে নিয়ে গেল বেচারিকে। মানুষকে এভাবে মৃত্যু পরিবেষ্টিত অবস্থায় কখনো দেখিনি। লণ্ঠন নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

নিস্তব্ধ অলিন্দে ওদের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম কিছুক্ষণ– তারপরেই তা থেমে গেল। আচমকা ভেসে এল চেঁচামেচি ঝটাপটি, ঘুসোঘুসির শব্দ। পরক্ষণেই চুল খাড়া হয়ে গেল একটা ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে। পায়ের আওয়াজ উর্ধ্বশ্বাসে আসছে আমার দিকেই এবং ফোঁস ফোঁস শব্দে ভীষণ আওয়াজ করে হাঁপাচ্ছে ছুটন্ত ব্যক্তি। লণ্ঠন ঘুরিয়ে আলো ফেললাম টানা লম্বা গলিপথে– দেখলাম বাতাসের বেগে ছুটে আসছে সেই মোটকা লোকটা– সারামুখে রক্ত মাখামাখি- ঠিক পেছনেই চকচকে খোলা ছুরি হাতে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে আসছে অসুরের মতো বিশাল চেহারার সেই কালো দাড়িওলা শিখটি। অসম্ভব বেগে দৌড়াচ্ছে খুদে সওদাগর। এত জোরে কখনো কোনো মানুষকে দৌড়তে দেখিনি। ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছে শিখ এবং কোনোমতে আমাকে পেরিয়ে সওদাগর যদি বেরিয়ে যায় খোলা জায়গায় ধরা মুশকিল হবে। মনটা নরম হয়ে এল বেচারার অবস্থা দেখে, পরমুহূর্তেই শক্ত হয়ে উঠল হিরে মানিকের কথা ভেবে। আমার পাশ দিয়ে উল্কার মতো বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বন্দুকটা গলিয়ে দিলাম দু-পায়ের ফাঁকে– গুলি খাওয়া খরগোশের মতো দুটো ডিগবাজি খেয়ে সে হড়কে গেল মাটির ওপর দিয়ে। উঠে দাঁড়াবার আগেই পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল ভীমদর্শন শিখ এবং দু-দুবার ছুরি বসিয়ে দিল বুকের বাঁ-দিকে। চেঁচনি গোঙানি কোনোটাই বেরোল না লোকটার গলা দিয়ে– আঙুল পর্যন্ত নড়ল না– পড়ে রইল নিথর দেহে। আছাড় খেয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলেছিল বোধ হয়। দেখুন স্যার, সব কথা বলব কথা দিয়েছিলাম বলেই কিছু

আর লুকোচ্ছি না। প্রত্যেকটা ঘটনা হুবহু বলে যাব। আপনাদের ভালো লাগলেও বলব, খারাপ লাগলেও বলব।

জল-মিশোনো হুইস্কি এগিয়ে দিয়েছিল হোমস। কথা থামিয়ে গেলাসের দিকে হাত বাড়াল স্মল। আমার ভেতর পর্যন্ত খিঁচড়ে গিয়েছিল লোকটার ওপর– গা রি-রি করছিল আতীব্র ঘৃণায়। এত বড়ো একটা খুনখারাপির মধ্যে এত সহজভাবে নিজেকে যে মিশিয়ে দিতে পারে, নিঃসন্দেহে সে অতি ভয়ংকর পুরুষ। তার ওপর গোড়া থেকেই পুরো ঘটনাটা বলে যাচ্ছে বেপরোয়া বাচাল ভঙ্গিমায়– কিছুই যেন হয়নি। আদালতে এ-লোকের বরাতে যে-দণ্ডই জমা থাকুক না কেন, আমার তরফ থেকে এক বিন্দু সহানুভূতিও ওকে দেওয়া যাবে না। হাঁটুতে হাত রেখে শার্লক হোমস আর জোন্স নিবিষ্ট চিত্তে শুনেছে ওর কাহিনি– মুখের পরতে পরতে কিন্তু ফুটে উঠেছে একই বিরাগ, স্মল তা লক্ষ করেছিল নিশ্চয়। তাই আরও বেপরোয়া গলায় আর ভঙ্গিমায় নতুন করে আরম্ভ করল কাহিনি।

মানুষ দুনিয়ায় কেউ আছে কি? দলে না-ভিড়লেই টুটি কাটা যেত। আবার দেখুন, আখমেত যদি আমার সামনে দিয়ে পালাত, তাহলেও পুরো ব্যাপার ফাঁস হয়ে যেত– আমি ধরা পড়তাম, কোর্ট মার্শাল হত, গুলি খেয়ে মরতাম। সমস্যাটা তাই মরণ বাঁচনের। হয় আখমেত মরবে, নয় আমি মরব। এ-রকম সমস্যায় দুনিয়ার কেউ কিন্তু মায়া দয়া দেখায় না।

হোমস সংক্ষেপে বললে, গল্পটা বলে যাও।

যাই হোক, আবদুল্লা, আমি আর আকবর লাশ বয়ে নিয়ে এলাম ভেতরে। বেঁটেখাটাে হলে কী হবে, বেজায় ভারী লোকটা। দরজা আগলানোর জন্যে রইল মাহোমৎ সিং। গোর দেওয়ার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল। আখমেতকে নিয়ে গেলাম সেখানে। অনেক গলিখুঁজি পেরিয়ে বেশ কিছুদূরে পেল্লায় ফাঁকা হল ঘর– ইট পলেস্তারা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। একদিকের মাটি আপনা থেকেই বসে যাওয়ায়

কবরের মতো গর্ত হয়ে গেছে। আখমেতকে তার মধ্যে ফেলে ওপরে আলগা ইটের টুকরো চাপা দিলাম। তারপর ফিরে এলাম রত্নপেটিকার কাছে।

মার খেয়েই আখমেত বাক্স যেখানে ফেলেছিল পড়েছিল সেইখানেই। সেই বাক্সই রয়েছে আমাদের টেবিলে। ওপরের হাতলে বাধা সিস্কের দড়ি থেকে ঝুলছিল চাবিটা, তালা খুলে লণ্ঠনের আলো ভেতরে ফেলতে ঠিকরে বেরিয়ে এল একঝলক দ্যুতি। আলো পড়ছে বাক্স ভরতি হিরে মানিকের ওপর– বিচিত্র বর্ণের আশ্চর্য রোশনাইতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পাশোরে থাকার সময় বাচ্চাবেলায় অনেক মণিমাণিক্যের গল্প শুনেছিলাম, পড়েছিলাম! এ সেই রূপকথার মানিক যেন, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না– চোখে ধাঁধা লাগে। চোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখবার পর উপুড় করে ঢাললাম রত্নরাশি– গুনে গুনে ফর্দ তৈরি করলাম। প্রথম শ্রেণির হিরেই ছিল এক-শো তেতাল্লিশটা, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হিরে 'গ্রেট মোগল ও ছিল তার মধ্যে। আর ছিল সাতানব্বইটা অতি উৎকৃষ্ট পান্না, এক-শো সত্তরটা চুনি, কতকগুলো অবশ্য আকারে ছোটাে! এ ছাড়াও ছিল চল্লিশটা পদ্মরাগমণি' , দশ দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা অলীক পাথর, বেশ কিছু ফিরোজা মণি, অনিক্স পাথর, বৈদূর্যমণি টার্কয়িজ নীলকান্ত এবং আরও অনেক দামি দামি পাথর– যার নাম তখন না-জানলেও পরে জেনেছিলাম। এইসঙ্গে ছিল অতি উৎকৃষ্ট শ-তিনেক মুক্তো– বারোটা মুক্তো গাঁথা ছিল সোনার ছোট্ট মুকুটে। ভালো কথা, সিন্দুক ফিরে পাওয়ার পর ভেতরে কিন্তু মুক্তোর সোনার মুকুটটা পাইনি।

গোনাগুনতির পর সিন্দুকে রত্ব নিয়ে গেটে গিয়ে দেখলাম মাহোমেৎ সিংকে। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফের প্রতিজ্ঞা করলাম কেউ কাউকে বিপদে ফেলে পালাবে না। দুর্দিনে পাশে দাঁড়াব এবং গুপ্তকথা প্রকাশ করব না। ঠিক করলাম দেশে শান্তি ফিরে না-আসা পর্যন্ত লুটের মাল কোথাও লুকিয়ে রাখব– পরে সমানভাবে ভাগাভাগি করে নেব। সেই মুহুর্তে ভাগবাঁটাােয়ারার কোনো

প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ওইরকম দামি পাথর কাছে দেখলেই সবার সন্দেহ হবে- কেল্লার মধ্যেও লুকিয়ে রাখার মতো সে-রকম জায়গা নেই। তাই বাক্স নিয়ে গেলাম যে হল ঘরে আখমেতকে কবর দিয়েছি সেই ঘরে; সবচেয়ে শক্ত একটা দেওয়াল থেকে ইট সরিয়ে রাখলাম। গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম সিন্দুক। জায়গাটার ঠিকানা মুখস্থ করে নিয়ে পরের দিন চারটে নকশা তৈরি করলাম, প্রত্যেকটার তলায় চারজনে সই করলাম– কেননা আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে-কাজে হাত দিয়েছি তা শেষ করব একসঙ্গে এবং কেউ কাউকে ঠকাব না। বুকে হাত দিয়ে বলছি এ-শপথ আজও আমি ভাঙিনি।

এরপর ভারতবর্ষের বিদ্রোহ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আপনাদের নতুন করে তা বলার দরকার নেই। উইলসন দিল্লি আর স্যার কলিনং লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধার করার পর মেরুদণ্ড ভেঙে গেল বিদ্রোহীদের। আরও বাহিনী আসা শুরু হতেই সীমান্তপ্রদেশে গা ঢাকা দিল নানাসাহেব। কর্নেল গ্রেথেড একটা ঝটিকা বাহিনী এনে আগ্রা অবরোধ করলেন এবং হটিয়ে দিলেন প্যান্ডিদের। আস্তে আস্তে শান্তি ফিরে এল দেশে। আমরা চারজনেও মশগুল হয়ে রইলাম লুটের মাল ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়ার সুখস্বপ্নে। স্বপ্ন অবশ্য চুরমার হয়ে গেল এক আঘাতেই– আখমেত হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হলাম চারজনই।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। প্রাচ্যের লোকগুলো বড়ো সন্দেহবাতিক হয়। বিশ্বস্ত অনুচরের জিম্মায় রত্নপেটিকা দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি রাজা– আর একজন অনুচরকে বলেছিল ছায়ার মতো প্রথমজনের পেছনে যেতে এবং সবসময়ে নজর রাখতে। কখনো যেন চোখের আড়াল না-করা হয়। হুকুমের নড়চড় হল না কোনোক্ষেত্রেই। দ্বিতীয় অনুচর ছায়ার মতো সে-রাতেও আখমেতের পেছন পেছন এসে তাকে দেখল কেল্লার ভেতর ঢুকতে। ভাবল বুঝি কেল্লায় ঠাঁই পেয়েছে আখমেত। তাই পরের দিন দরখাস্ত পেশ করে নিজেও ঢুকল দুর্গে– কিন্তু আখমেতের টিকি দেখতে পেল না। অদ্ভুত ব্যাপার তো। তাই

সময়মতো রহস্যটা নিবেদন করল প্রহরীদের জনৈক সাজেন্টের কাছে এবং যথাসময়ে সাজেন্ট গিয়ে খবরটা অধিনায়কের কানে তুলে দিল। তক্ষুনি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল চারদিক– বেরিয়ে পড়ল আখমেতের মৃতদেহ। কপাল খারাপ একেই বলে। বিপদ কেটে গেছে ভেবে লুঠের মাল ভাগাভাগির স্বপ্ন যখন দেখছি, ঠিক তখনই গ্রেপ্তার হলাম চারজনে– তিনজন ওই রাতে ফটক পাহারা দিচ্ছিলাম বলে, চতুর্থজন নিহত ব্যক্তির পথসঙ্গী ছিল বলে। বিচারকালে জহরত নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না। কেননা যার জহরত সেই রাজাকেই নির্বাসন দণ্ড দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে, কাজেই পেটিকা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না কারোরই। তবে খুন যে একটা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং আমরা চারজনেই জড়িত সেই খুনের মধ্যে। শিখ তিনজনের ওপর যাবজীবন কারাদণ্ডের হুকুম হল। ফাঁসিতে মৃত্যুর রায় এল আমার ওপর। শেষ অবধি অবশ্য আমাকেও যাবজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় অন্যদের মতো।

আমাদের তখনকার অদ্ভুত অবস্থাটা কল্পনা করুন। চারজনেরই পা একসঙ্গে বাঁধা– ইহজীবনে মুক্তির আশা নেই! অথচ চারজনের প্রত্যেকেই এমন একটা গুপ্ত খবর জেনে বসে আছি যার দৌলতে প্রত্যেকেই এক একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে রাজার হালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারি– যদি একবার ছাড়া পাই। এ অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায়! আমিও পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু চিরকালই আমি একটু গোঁয়ার টাইপের। তাই মনের মধ্যে ধিকিধিক আগুন নিয়েও প্রতিদিন লাথিঝাঁটা খেয়েছি, জেলের অখাদ্য ভাত খেয়ে ক্ষুধা তেষ্টা মিটিয়েছি– প্রতি মুহূর্তে কিন্তু মনে হয়েছে বাইরে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে রাজ ঐশ্বর্য– গিয়ে শুধু তুলে নিলেই হল! তাই মুখ বুজে সব সয়েছি আর দিন গুনছি সুদিন আসার।

অবশেষে মনে হল যেন সুদিন এসেছে। আগ্রা থেকে মাদ্রাজ পাঠানো হল আমাকে। সেখান থেকে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার দ্বীপে। বেশ কয়েকজন

শ্বেতকায় কয়েদি ছিল উপনিবেশে। আমার ব্যবহার ভালো হওয়ায় শিগগিরই কর্তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে গেলাম। মাউন্ট হ্যারিয়েটেরং সানুদেশে ছোট্ট হোপটাউনে একটা কুঁড়েঘরের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই পেলাম। জায়গাটা নির্জন, তার ওপর জ্বরজ্বালা লেগেই আছে। গোদের ওপর বিষফোড়া হল নরখাদকের ভয়। নিজের চত্বর ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক করলেই বিষ-মাখানো তির এসে বিঁধবে গায়ে। খোড়াখুড়ি, রাস্তা আর নর্দমা বানানো ছাড়াও চুপড়ি আলুর চাষ করতে হত আমায়, ডজন-খানেক আরও কাজে ব্যস্ত থাকতে হত সারাদিন। রাত্রিবেলা শুধু সময় পেতাম গল্পগুজব করার। অন্যান্য কাজের মধ্যে ডাক্তারের কথামতো ওষুধ দেওয়ার দায়িত্বও ছিল কাঁধে, সেই কাজ করতে গিয়ে ডাক্তারি বিদ্যেও কিছু কিছু শিখে নিয়েছিলাম। সর্বক্ষণ কিন্তু পালানোর সুযোগ খুঁজতাম– কিন্তু তা সম্ভব ছিল না কোনোমতেই। একটা দ্বীপ থেকে আরেকটা দ্বীপ কম করে এক-শো মাইল দূরে হাওয়াও তেমন নেই ওদিককার সমুদ্রে, সুতরাং পালানোর সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

ডক্টর সোমারটন খুব হাসিখুশি টাইপের মিশুকে ছোকরা। অন্যান্য তরুণ অফিসাররা রাত হলেই তার বাড়ি গিয়ে আড্ডা মারতেন আর তাস খেলতেন। ডাক্তারখানায় বসে ওষুধ বানাতাম আমি। মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হলে ডাক্তারখানার আলো নিভিয়ে মাঝের জানলায় দাড়িয়ে কথা শুনতাম আর খেলা দেখতাম। আমি নিজে তাসের ভক্ত। খেলা দেখতে ভালোবাসি– মনে হয় যেন নিজেই খেলছি। আড্ডায় থাকতেন ডাক্তার নিজে, দেশি সৈন্যবাহিনীর অফিসার মেজর শোল্টো, ক্যাপ্টেন মর্সটান, লেফটেন্যান্ট ব্রমলি ব্রাউন! আর জনা দু-তিন জেল অফিসার– প্রত্যেকেই পাকা জুয়াড়ি, খেলতেন ঝুঁকি বাঁচিয়ে, অত্যন্ত কৌশলে। পার্টিটা ছোট্ট। কিন্তু জমাটি। 'একটা জিনিস দেখে কিন্তু খটকা লেগেছিল প্রথম থেকেই। সামরিক অফিসাররা ক্রমাগত হারতেন, অসামরিক অফিসাররা ক্রমাগত জিততেন। খেলায় কারচুপি ছিল বলতে চাই না– কিন্তু

প্রতিবারেই দেখেছি এই একই কাণ্ড। অসামরিক জেল-অফিসাররা আন্দামানে জেল ডিউটি নিয়ে আসার পর থেকে একনাগাড়ে তাস খেলে এসেছেন- একে অপরের খেলার ধারার শেষ পর্যন্ত হিসেব রাখতেন। কিন্তু সামরিক অফিসাররা অত ধার ধারতেন না, তারা খেলতেন শুধু তাস পিটিয়ে সময় কাটানোর জন্যে। রাতের পর রাত চলেছে হারার পালা। সামরিক অফিসারদের পকেট যতই হালকা হয়েছে ততই তাদের রোখ চেপে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি চোট খেয়েছিলেন মেজর শোল্টো। প্রথম প্রথম খেলতেন নোট আর সোনা ফেলে। শিগগিরই দেখা গেল মোটা টাকার দরকার হলেই ধার নিচ্ছেন অঙ্গীকারপত্র লিখে। মাঝে মাঝে জিততেন। সাহস বেড়ে যেত, তারপরেই আবার গো-হারান হারতেন, সারাদিন কালো বাজের মতো দাপিয়ে বেড়াতেন নানা কাজে আর মদ গিলতেন শরীর সইতে পারছে না জেনেও।

একরাতে রোজ যা হারতেন তার চাইতেও বেশি হারলেন। টলতে টলতে কোয়ার্টারে ফিরছিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান আর মেজর শোল্টো আমার কুঁড়ের পাশ দিয়ে। দু-জনেই হরিহর-আত্মা বন্ধু– ছাড়াছাড়ি কখনো হত না। ঘরে বসে শুনলাম মেজর শোল্টো দুঃখ করছেন অতগুলো টাকা হেরে যাওয়া নিয়ে।

বললেন– মর্সটান আমি পথে বসেছি। সর্বস্বান্ত হয়েছি। কাগজপত্র না-আনলেই নয়।

বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে মর্সটান বললেন- ননসেন্স! আমার নিজের অবস্থাও কি খুব ভালো? তবে–

এর বেশি আর শুনতে পেলাম না দু-জনে দূরে সরে যাওয়ায়। কিন্তু যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। নতুন মতলব উঁকি দিল মাথায়।

দিন দুয়েক পরে মেজর শোল্টোকে সকালবেলায় পায়চারি করতে দেখে ভাবলাম, কথা বলার এই-ই সুবর্ণ সুযোগ!

বললাম, মেজর, আপনার একটা উপদেশ চাই।

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে মেজর বললে, কী ব্যাপার, স্মল?

বললাম, আমি জানতে চাই গুপ্তধন ঠিক কার হাতে দেওয়া উচিত। পাঁচ লক্ষ পাউন্ড দামি একটা গুপ্তধনের ঠিকানা আমি জানি। নিজে যখন তা ভোগ করতেই পারব না, ভাবছিলাম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলে কেমন হয়। তাতে আমার জেল-মেয়াদটা তো কমতে পারে।

পাঁচ লক্ষ পাউন্ড! দম আটকে এল যেন মেজরের। খরখরে চোখে চাইলেন আমার মুখের দিকে ঠাট্টা করছি কিনা দেখবার জন্যে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। জহর আর মুক্তো মিলিয়ে। এমন জায়গায় রয়েছে যে, যে কেউ নিতে পারে।

মজাটা কী জানেন। আসল মালিককে দেশছাড়া করেছে সরকার। কাজেই এ-গুপ্তধনটা এখন যে আগে পাবে তার হবে।

আমতা আমতা করে মেজর বললেন, কাকে আর দেবে, স্মল। গভর্নমেন্টকে দিয়ো। বললেন বটে। কিন্তু তোতলামি দেখেই বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। সহজভাবে বললাম, খবরটা তাহলে গভর্নর জেনারেলকে দিতে বলেছেন?

অত তাড়াতাড়ি করার কী দরকার? পরে পস্তাতে হবে। খুলে বলো আগে শুনি।

বললাম পুরো কাহিনি, কয়েক জায়গা একটু পালটে দিতে হল যাতে জায়গাটা না-চিনতে পারেন। শেষ করার পর দেখি উনি চিন্তায় পাথর হয়ে গেলেন। ঠোঁট কাঁপছে দেখেই বুঝলাম ভেতরে তোলপাড় চলেছে, দ্বন্দ শুরু হয়েছে।

অবশেষে বললেন, স্মল ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে আর কারো কাছে মুখ খুলো না। আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

দু-রাত পরে নিশুতি রাতে লণ্ঠন হাতে আমার কুঁড়েতে এলেন মেজর শোল্টো আর ক্যাপ্টেন মর্সটান।

মেজর বললে, স্মল, গল্পটা তুমি আবার শোনাও ক্যাপ্টেন মসটানকে। 'যা আগে বলেছিলাম, এখনও তাই বললাম।'

মেজর বললেন, কী মনে হয়? সত্যি? এগোনো যায়?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান।

মেজর তখন বললেন, শোনো স্মল, তোমার গুপ্তধন নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা দুই বন্ধু। একটা সিদ্ধান্ততেই এসেছি। বিষয়টা ব্যক্তিগত– সরকারি মোটেই নয়। ব্যক্তিগত সমস্যার নিষ্পত্তি ব্যক্তিগতভাবেই করা উচিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– কী দাম চাও তুমি? তোমার হয়ে গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করে আনতে পারি, গুপ্তধনের চেহারাটাও একটু দেখতে পার– শর্ত যদি মনের মতো হয়। খুব সহজ শান্তভাবে কথাগুলো বললেন, দেখলাম লোভ ও উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে মেজরের।

আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করেও ভেতরে ভেতরে ওঁর মতোই উত্তেজিত হয়ে বললাম, এক্ষেত্রে সবাই যে-শর্ত চায়, আমারও তাই শর্ত। আমাকে মুক্তি দিতে হবে– আমার তিন বন্ধুকেও জেলের বাইরে আনতে হবে। তাহলেই আপনাদের অংশীদার করে নিয়ে পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেব আপনাদের- ভাগ করে নেবেন দু-জনে। মাথাপিছু পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড, বললাম আমি।

পাঁচ ভাগের এক ভাগ! সে আর এমন কী!

কিন্তু অসম্ভব আবদার করছ যে! মুক্তি দেব কী করে?

তাও ভেবেছি, বললাম আমি। পালাবার একমাত্র অন্তরায় হল এতখানি সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত বোট আর তদ্দিনের খাবারদাবার আমাদের নেই। কলকাতা বা মাদ্রাজে পাল তোলা হালকা বজরা অনেক আছে– একটা পেলেই কাজ চলে যাবে আমাদের। ওইরকম একটা বোট নিয়ে আসুন এখানে। রাতে

অন্ধকারে উঠে পড়ব তাতে। ভারতবর্ষের উপকূলে কোথাও যদি নামিয়ে দিতে পারেন তাহলেই জানবেন আপনাদের দিক দিয়ে চুক্তি রক্ষে হবে।

একজন হলে করতাম, বললেন উনি।

আমি বললাম, করলে চারজনের জন্যেই করতে হবে– নইলে নয়। শপথ করেছি আমরা, যা করব চারজনে একসঙ্গে করব।

মর্সটান, স্মলের কথার দাম আছে। বন্ধুদের ডুবিয়ে নিজে বাঁচতে চায় না। আমার তো মনে হয় এমন লোককে বিশ্বাস করা যায়।

মর্সটান বললেন, কাজটা কদর্য। তাহলেও তুমি যখন বলছ দস্তুরির টাকায় নোংরামি পুষিয়ে যাবে, তখন না হয় করা যাবে।

মেজর বললেন, স্মল তোমাকে বাজিয়ে দেখতে চাই। যা বললে তা সত্যি কিনা যাচাই করতে চাই। বাক্স কোথায় আছে বলো। ছুটি নিয়ে আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। প্রতি মাসেই তো রিলিফ-বোর্ট যাচ্ছে ভারতবর্ষে– আমি রওনা হব সেই বোটে।

মেজর গরম হয়ে উঠতেই আমি ঠান্ডা মেরে গেলাম। বললাম, অত তাড়াহুড়ো করলে তো চলবে না। তিন বন্ধু রাজি আছে কিনা জানতে হবে। বললাম না আপনাদের, যা করব চারজনে একসঙ্গে করব।

ধাঁ করে রেগে গিয়ে মেজর বললেন, বাজে কথা বোলো না! তোমার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হচ্ছে, তার মধ্যে কালা আদমি তিনটে আসে কী করে?

আমি বললাম, কালো কি নীল বুঝি না– আমরা চারজনে এক, একসঙ্গেই থাকব। যাই হোক, আর একটা অধিবেশনে নিষ্পত্তি হয়ে গেল সব কিছুর– এ-অধিবেশনে হাজির রইল মাহোমৎ সিং, আবদুল্লা খান, আর দোস্ত আকবর। অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হল। দু-জন অফিসারকেই আগ্রা ফোর্টের একটা নকশা দেব– নকশায় চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেব কোথায় কোথায় আছে গুপ্তধন। আমি সত্যি বলেছি কিনা যাচাই করার জন্যে ভারতবর্ষে

যাবেন মেজর শোল্টো। বাক্স দেখতে পেলে সেখানেই রেখে দেবেন। একটা ছোটো বজরায় খাবার দাবার বোঝাই করে আন্দামানে পাঠিয়ে দেবেন– বজরা এসে নোঙর ফেলবে রাটল্যান্ড দ্বীপে– আমরা সেখানে গিয়ে উঠব বজরায়। মেজর শোল্টো তখন নিজের কাজে ফিরে আসবেন। তারপর ছুটির দরখাস্ত করবেন ক্যাপ্টেন মর্সটান, আগ্রায়, গিয়ে মিলবেন আমাদের সঙ্গে হীরে মানিক ভাগ বাটোয়ারা হবে তারপর– মেজর শোল্টোর বখরাও নেবেন ক্যাপ্টেন মর্সটান। ছ-জনেই প্রতিজ্ঞা করলাম কোনোমতেই এ-ব্যবস্থার অন্যথা করব না। মন আর মুখ দিয়ে এভাবে সচরাচর কেউ প্রতিজ্ঞা করে না। সারারাত বসে দুটো নকশা তৈরি করে সই করলাম চারজন– আবদুল্লা, আকবর, মাহোমৎ আর আমি।

লম্বা কাহিনি শুনে অধীর হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছি– মি. জোন্স তো ছটফট করছেন আমাকে খাঁচায় পোরবার জন্য। যদ্দূর সম্ভব সংক্ষেপে বলছি, শোল্টো শয়তান ভারতবর্ষে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। কিছুদিন পরেই একটা ডাক জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় শোল্টোর নাম আমাকে দেখালেন ক্যাপ্টেন মর্সটান। হঠাৎ নাকি কাকা মারা গেছেন, কাকার অনেক টাকা পেয়ে সামরিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন- পাঁচ স্যাঙাতকে পথে বসাতে একটুও দ্বিধা না-করে। দিন কয়েক পরে আগ্রায় গিয়ে মর্সটান দেখলেন যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে– রত্নপেটিকা সত্যিই উধাও হয়েছে। যে-শর্তের বশে গুপ্তকথা ফাঁস করেছিলাম, তার কোনোটাই না-রেখে স্কাউন্ডেলটা একাই আত্মসাৎ করেছে বাক্স-বোঝাই রত্ন। সেদিন থেকে আমার জীবনধারণের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে একটাই– প্রতিহিংসা। সারাদিন ভাবতাম কীভাবে নেওয়া যায় প্রতিহিংসা– সারারাত বিরাম দিতাম না সেই চিন্তায়। শয়নে স্বপনে জাগরণে ছায়ার মতো প্রতিহিংসা কামনা তাড়া করত আমাকে– কুরে কুরে খেত মগজের ভেতরটা– প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ঠাঁই পেত না মাথায়।

আইনকানুনের তোয়াক্কা রাখিনি– ফাঁসিকাঠের সম্ভাবনাকে আমল দিইনি। কপালে যা থাকুক, প্রতিহিংসা আমাকে নিতেই হবে। এমনকী আগ্রার রত্নও নগণ্য হয়ে গিয়েছিল আমার তখনকার উদয়াস্ত শোল্টো-নিধন চিন্তার ফলে।

এ-জীবনে আমি অনেক কিছুই করেছি। যা করব বলে মনে করেছি তাই করেছি। করতে পারিনি এমন দৃষ্টান্ত একটাও নেই। কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে অনেকগুলো দীর্ঘ বছর। বলেছি শুনেছেন নিশ্চয়, ওষুধপত্র ডাক্তারির কিছু কিছু শিখেছিলাম কম্পাউন্ডারি করতে করতে। একদিন কয়েকজন কয়েদি জঙ্গলের মধ্যে একজন লোককে বয়ে নিয়ে এল ডাক্তারখানায়। ডক্টর সোমারটনের সেদিন জ্বর হয়েছিল। লোকটাকে আমিই দেখলাম। আন্দামানের আদিবাসী। অসুখে ভুগে ভুগে মৃত্যু সামনে দেখে নির্জন জঙ্গলে গিয়েছিল মরবার জন্যে। লোকটা সাপের বাচ্চার মতোই বিষধর জেনেও চিকিৎসা করলাম– দু-মাস পরে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল। সেই থেকে আমার ন্যাওটা হয়ে গেল সে। জঙ্গলে যেতে হত না। দিনরাত আমার কুঁড়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করত। ওর ভাষাও কিছু কিছু শিখে নিলাম– তাতে ও আমার আরও বেশি ন্যাওটা হয়ে পড়ল।

লোকটার নাম টোঙ্গা! খুব ভালো নৌকা চালাতে পারত। নিজের একটা বড়ো ছিপ নৌকেও ছিল। আমার জন্য করতে পারে না হেন কাজ ছিল না টাঙ্গার কাছে– এত ন্যাওটা ছিল আমার। মুক্তির পথ খুঁজে পেলাম ওর মধ্যে। শলাপরামর্শ করলাম। পুরোনো একটা ঘাটে লোকজন কেউ যায় না, পাহারাদারও নেই। কোনো এক গভীর রাতে ছিপ নৌকো নিয়ে সেখানে আসবে টোঙ্গা। বলে দিলাম অনেকগুলো লাইয়ের খোল ভরতি করে যেন জল আনে, সেই সঙ্গে মিষ্টি আলু, নারকেল আর চুপড়ি আলু।

টোঙ্গা লোকটা যেমন অনুগত, তেমনি খাঁটি। ও-রকম বিশ্বাসী অনুচর দুনিয়ায় কেউ কখনো পেয়েছে কিনা সন্দেহ। নৌকো নিয়ে বিশেষ সেই রাতটিতে

ভাঙা ঘাটে হাজির হল সে। কপাল কী দেখুন। ঠিক সেইদিনই কয়েদিদের একজন গার্ড হাজির সেখানে। অতি যাচ্ছেতাই লোক, শয়তান বললেই চলে– জাতে পাঠান। সুযোগ পেলেই আমাকে অপমান করত, গালাগালি দিত, মেরে গায়ে কালসিটে ফেলে দিত। সব হজম করে গেছি– প্রতিহিংসার জন্য ভেতরটা জ্বলে পুড়ে গেছে, কিন্তু কিছু করতে পারিনি। সুযোগ পেলাম সেই রাতে। স্বয়ং ভগবানই যেন দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রতিহিংসার সুযোগ বাড়িয়ে ধরলেন আমার সামনে। আমার দিকে পেছন ফিরে কাঁধে বন্দুক নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়েছিল সে। এদিক-ওদিক তাকালাম ঠুকে ঘিলু বার করে দেওয়ার মতো পাথরের সন্ধানে– পেলাম না।

তারপরেই একটা অদ্ভুত চিন্তা এল মাথায়। অন্ধকারে বসে পড়ে বেল্ট খুলে হাতে নিলাম কাঠের পা-খানা। তিন লাফে এসে দাঁড়ালাম পেছনে। বোঁ করে ঘুরে দাড়িয়ে বন্দুক তুলল সে। ততক্ষণে নেমে এসেছে আমার কেঠো পা– এক মারেই কপাল-টপাল ভেঙে ঢুকে গেল ঘিলুর মধ্যে। জঙ্গলে সেখানে যদি কখনো যান, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘিলুর চিহ্ন এখনও দেখতে পারেন।

লাঠি হাকিয়ে তাল সামলাতে না-পেরে আমিও হুড়মুড়িয়ে পড়লাম পাঠানের গায়ে এবং দু-জনেই ঠিকরে পড়লাম মাটিতে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে আর নড়ছে না। উঠে পড়লাম নৌকায়। একঘণ্টা লাগল মাঝ-সমুদ্রেতে পৌছোতে। টোঙ্গা ওর যাবতীয় পার্থিব সম্পদ সঙ্গে এনেছিল– দেবদেবী আর অস্ত্রশস্ত্র কিছুই বাদ দেয়নি। জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল একটা লম্বা বাঁশের বর্শা আর কিছু নারকেল ছোবড়ার মাদুর। এই দুটো জিনিস দিয়ে পাল বানিয়ে তুলে দিলাম নৌকার ওপর। স্রেফ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে দশদিন অর্থই জলে ভেসে রইলাম। তারপর একটা সওদাগরি জাহাজ তুলে নিল আমাদের! মালয় তীর্থযাত্রী নিয়ে জাহাজ যাচ্ছিল সিঙ্গাপুর থেকে সৌদি আরবের জেড্ডায়– মক্কায়ই ঢোকবার মূল প্রবেশপথের দিকে। সেই ভিড়-ভাট্টার মধ্যে দিব্যি মিশে গেলাম আমি আর

টোঙ্গা! চমৎকার একটা গুণ ছিল ওদের। গায়ে পড়ে আলাপ করত না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেটের কথা বার করবার চেষ্টা করত না।

আমার সেই একান্ত অন্তরঙ্গ পুঁচকে সাথিকে নিয়ে যেসব অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল– তার সব বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে, আপনাদের ধৈর্য্য ফুরোবে। ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলাম দুনিয়ায় নানান জায়গায়– একটার পর একটা বাঁধা আসায় লন্ডন ঢোকা আর হয়ে উঠল না। লক্ষ্যচ্যুত অবশ্য হইনি– একদিনের জন্যেও প্রতিহিংসার চিন্তা আমাকে ছেড়ে যায়নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম শোল্টোকে। তারপর এক সময়ে বছর তিন চারেক আগে ইংলন্ডে ফিরে এলাম। শোল্টোকে খুঁজে বের করতে বেগ পাইনি। হিরে মানিক বেচে দিয়েছে কিনা আগে সেই খোঁজ নিলাম! বন্ধুত্ব করলাম একজনের সঙ্গে। নিয়মিত খবর দিত সে। নামটা বলব না! জেলখানার ভেতরে আর কাউকে ল্যাজে বেঁধে আনতে চাই না। যাই হোক, খবর পেলাম হিরে মানিক এখনও কাছেই আছে– বিক্রি করেনি। বহু চেষ্টা করলাম শয়তানটার কাছে যাওয়ার– কিন্তু কোনোদিক দিয়েই পারলাম না। মহা ধড়িবাজ ছিল লোকটা– তার ওপর পাহারায় রেখেছিল দু-দুটো প্রাইজফাইটার লড়াইবাজ মস্তানকে। দুই ছেলে আর খিদমতগারও পাহারা দিত দিন রাত।

যাই হোক, একদিন খবর পেলাম শোল্টো মরতে বসেছে। মরে গিয়ে আমার হাত ফসকে পালাবে ভেবে পাগল হয়ে তখুনি ছুটলাম বাগানে– জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখলাম দু-পাশে দুই ছেলে নিয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। তিন জনের টক্কর একাই নিতাম ভেতরে ঢুকে– তার আগেই আমার ওপর চোখ পড়তেই চোয়াল ঝুলে পড়ল শোল্টোর। বুঝলাম মারা গেল শয়তান? সেই রাতেই ঘরে ঢুকে কাগজপত্র লাট-ঘাট করলাম। রত্নগুলো লুকিয়েছে যেখানে, তার ঠিকানা যদি কোথাও রেখে থাকে, এই আশায় তন্নতন্ন করে খুঁজলাম সব কিছু। কিন্তু সে-রকম কোনো হদিশ পেলাম না। রাগে হতাশায় বুনো বর্বরের মতো খেপে

গিয়েছিলাম তখন। চলে আসার সময় মনে হল শিখ বন্ধুদের সঙ্গে যদি দেখা হয়। তখন যদি বলি তাদের যে শোল্টো মরে যাওয়ার পরও আমাদের চারজনের ঘৃণার নিদর্শন তার বুকের ওপর রেখে এসেছি, তাহলে নিশ্চয় খুশি হবে ওরা। তাই নকশায় যেভাবে চারজনে সই করেছিলাম, সেই চারের সংকেত একটা কাগজে লিখে পিন দিয়ে এঁটে দিলাম ওর বুকে। বোকা বানিয়ে যাদের ঐশ্বর্য লুঠ করে এনেছে, তাদের তরফ থেকে কোনো চিহ্ন না-নিয়ে কবরে যাবে শোল্টো– এ কি হয়। একটা চিহ্ন অন্তত সঙ্গে যাক।

কালো নরখাদক হিসেবে টোঙ্গাকে দেখিয়ে দু-বেলার খাওয়া জোটাচ্ছিলাম আমি। কচমচ করে কাচা মাংস চিবিয়ে খেয়ে যুদ্ধ-নৃত্য নাচত টোঙ্গা– দিনের শেষে শুধু পেনিতেই ভরে উঠত আমার টুপি। পণ্ডিচেরি লজের সব খবরই কানে আসত। রত্ন নাকি এখনও পাওয়া যায়নি– কিন্তু খোঁজ চলছে। কয়েক বছর গেল এইভাবে। তারপর এল সেই খবর। রত্ন পাওয়া গেছে। একদম ওপরতলায় মি. বার্থোলিমিউর রাসায়নিক গবেষণাগারে আছে রত্নপেটিকা। তখুনি চলে এলাম পণ্ডিচেরি লজে। অনেক দেখেও ভেবে পেলাম না কাঠের পা নিয়ে অত উঁচুতে উঠব কী করে। শুনি ছাদে একটা ঠেলা-দরজা আছে। মি. শোল্টো রাত্রে কখন খেতে যান, সে-খবরও পেয়েছিলাম। টোঙ্গাকে দিয়ে কাজ ফতে করবার ফন্দি আটলাম। ওর কোমরে এক বান্ডিল দড়ি জড়িয়ে দিলাম। দেওয়াল আর নল বেয়ে বেড়ালের মতো সর সর করে ছাদে উঠে গেল টোঙ্গা– কিন্তু কপাল খারাপ আমার– দেখা গেল বার্থোলোমিউ শোল্টো খেতে যাননি, ঘরে বসে আছেন। বসে বসেই মারা গেলেন টাঙ্গোর বিষ-মাখানো তিরে। ঘরে ঢুকে দেখলাম পেখম তুলে ময়ূরের ফুর্তিতে নাচছে টাঙ্গো– ওর ধারণা বাহাদুরির কাজ করে ফেলেছে। দেখেই রক্ত চড়ে গেল মাথায়। দড়ির আগা দিয়ে পিটিয়ে মেরেই ফেলতাম সেদিন– হাচড়-পাচড় করে সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে গেল বলে রক্ষে! মার খেয়ে আর রক্তখেকো পিশাচ জাতীয় গালাগাল শুনে সেদিন ও অবাকই হয়েছিল। দড়ি বেঁধে

রত্নপেটিকা আগে নামিয়ে দিলাম নীচে। তারপর দড়ি বেয়ে হড়কে নেমে এলাম নিজে। আসবার আগে চারের সংকেত রেখে এলাম টেবিলের ওপর যাতে বোঝা যায়, রত্নে যাদের অধিকার সর্বাগ্রে, অনেক হাত ঘুরে রত্নপেটিকা এখন তাদেরই কাছে। নেমে যাওয়ার পর টোঙ্গা দড়ি টেনে তুলে নিয়ে জানলা বন্ধ করে যে-পথে উঠেছিল– সেই পথেই নেমে গেল নীচে।

'আর কিছু বলার তো দেখছি না। একজন মাঝির কাছে শুনেছিলাম অরোরা লঞ্চকে টেক্কা মারার মতো স্পিড নাকি এ-তল্লাটে কোনো লঞ্চেরই নেই। তাই ঠিক করলাম ওই লঞ্চেই চম্পট দিতে হবে। বুড়ো স্মিথকে অনেক টাকা দিয়ে রফা করলাম, জাহাজে তুলে দিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা গোলমেলে আঁচ করে কৌতুহল দেখায়নি স্মিথ– গুপ্ত কথা জানতে চায়নি। যা বললাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে জানবেন। সত্যি বললাম শুধু নিজে বাঁচবার জন্যে, সত্যি বলাটা বাঁচবার একমাত্র পথ বলে, আপনাদের চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়– কেননা আপনারা আমার খুব একটা ভালো করেননি। আমি চাই দুনিয়া জানুক মেজর শোল্টো আমার সঙ্গে কী দুর্ব্যবহার করেছে। চারজনের প্রতি কী জঘন্য আচরণ করেছে ও তার জন্যে আমি দায়ী নয় মোটেই।

শার্লক হোমস বললে, কাহিনিটা সত্যিই অত্যন্ত অসাধারণ। এ-রকম একটা কৌতুহলোদ্দীপক মামলার উপযুক্ত উপসংহার বটে। কাহিনির শেষের দিকে যা বললে, তার মধ্যে নতুন কিছু পেলাম না। সবই জানি– একটা বিষয় ছাড়া: দড়িটা তুমিই সঙ্গে এনেছিলে। এইটুকুই কেবল জানতাম না। ভালো কথা, আমি ভেবেছিলাম টোঙ্গার কাছে বিষ-মাখানো তির আর নেই। তা সত্ত্বেও ছুটন্ত লঞ্চ থেকে একটা তির আমাদের টিপ করে ছুড়ল কেমন করে?

তিরের থলিটা হারিয়ে ফেললেও ব্লো-পাইপের মধ্যে একটা থেকে গিয়েছিল।

আ! তাও তো বটে! এটা তো মাথায় আসেনি আমার। বললে হোমস।

অ্যাথেলনি জোন্স বললে, হোমস, আপনার রসবোধের তারিফ করতে হয়; অপরাধের ব্যাপারেও আপনি সমঝদার ব্যক্তি, রসজ্ঞ পুরুষ। তবে কী জানেন, কর্তব্য বড়ো কঠিন। আপনার আর আপনার বন্ধুর কথা রাখতে গিয়ে সীমার বাইরে যেতে হয়েছে আমাকে। গল্পকার এই লোকটিকে তালাচাবি দিয়ে খাঁচায় না-পোরা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। গাড়ি এখনও নীচে দাঁড়িয়ে। দু-জন ইনস্পেকটরও রয়েছে নীচের তলায়। সাহায্যের জন্য অনুগৃহীত রইলাম আপনাদের দু-জনের কাছেই। বিচার আরম্ভ হলে কিন্তু আপনাদের দরকার হবে। গুডনাইট।

গুডনাইট আপনাদের দু-জনকেই, বললে স্মল।

স্মল, আগে তুমি বেরোও তো, ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললে জোন্স। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যা করেছ, আমার মাথায় সেইভাবে কেঠো পা হাঁকড়াবার সুযোগ তোমায় দিচ্ছি না।

দুই মূর্তি নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ধূমপান করলাম আমি আর হোমস। তারপর বললাম, নাটক তো শেষ হল। তোমার তদন্ত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সুযোগও আমার ফুরোল– এই কেসই শেষ কেস। মিস মর্সটান আমাকে তার ভাবী স্বামী নির্বাচন করেছেন, আমি তাতে বর্তে গেছি।

ঠিক যা ভয় করেছিলাম। আমি কিন্তু ভায়া অভিনন্দন জানাতে পারছি না তোমাকে!

শুনে মনে বড়ো লাগল। আহত কণ্ঠে বললাম, আমার পছন্দ তোমার মনোমতো নয় কেন জানতে পারি?

আরে, তা নয়। পছন্দ তোমার ঠিকই হয়েছে। মিস মর্সটানের মতো মধুর স্বভাবের তরুণী খুব কমই দেখেছি আমি– যে-কাজ আমরা করেছি উনিও তাতে সাহায্য করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। এ-ব্যাপারে তিনি একটা জ্বলন্ত প্রতিভা– বাবার অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে থেকে আগ্রা নকশা উদ্ধার করে

কীভাবে এতদিন রেখেছিলেন ভাব দিকিনি। তবে কী জান ভালোবাসা জিনিসটা আবেগপ্রসূত– তা কঠিন, শীতল, নিকষ যুক্তির অন্তরায়। আমি কিন্তু শেষেরটাকেই মাথায় রাখি, প্রথমটাকেই পায়ে। বিয়ে তাই এ-জীবনে করব না– বিচারবুদ্ধি পাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায়– এই ভয়েই করব না।

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, আশা করি আমার বিচারবুদ্ধি শেষপর্যন্ত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু ভায়া তোমাকে যে ভীষণ কাহিল লাগছে!

তা তো লাগবেই, ভয়ংকর পরিশ্রমের জের শুরু হয়ে গেছে যে। সামনের সাতটা দিন স্রেফ ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে থাকব।

সত্যিই তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ! অন্যের ক্ষেত্রে যা শুধু কুঁড়েমি তোমার ক্ষেত্রে তার পালা বদল ঘটে বিপুল প্রাণশক্তি আর প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে।

ঠিক বলেছ। আমি প্রথম শ্রেণির নিষ্কর্মা হতে পারি, আবার দারুণ কর্মঠ প্রাণবন্ত পুরুষও হয়ে উঠতে পারি। দু-টিই পাবে এই আমার মধ্যে। গ্যেটের লাইন ক-টা"   তাই প্রায় মনে পড়ে:

Schade dass die Natur nur einen Mensch aus dir schuf, Denn Zum Wurdigen Mann War and Zum Schelmen der Stoff.

ও হ্যাঁ, নরউড রহস্যে আমার একটা অনুমান শেষ পর্যন্ত সত্যি হল দেখছি। সত্যিই বাড়ির মধ্যে একজন স্যাঙাত পুষে রাখা হয়েছিল– নাম তার লাল রাও। খাসা চাকর। জোন্স তাহলে অন্তত একজনকেও নিজে থেকে জালে টানতে পেরেছে এবং এ-ব্যাপারে কৃতিত্বের বখরা কেউ পাবে না।

আমি বললাম, ভাগবাটোয়ারা কিন্তু মোটেই ন্যায্য হল না। আগাগোড়া তুমি খেটে মরলে। কিন্তু আমি পেলাম একজন বউ, জোন্স পেল কৃতিত্ব, তোমার জন্য রইল কী?

লম্বা, সাদা হাতখানা তাদের দিকে বাড়িয়ে শালক হোমস বললে, কোকেনের এই বোতলটা।